প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

- আল কুরআনের আলোকে মানুষ
  মোহাম্মাদ জাওয়াদ রুদগার
- মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্ব
  সাইয়্যেদ আকবার সাইয়্যেদীনিয়া
- ইমাম হুসাইন (আ.)-এর রক্তরঞ্জিত শাহাদাত : প্রেক্ষিত, উদ্দেশ্য ও প্রভাব
  আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
- ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কতিপয় খুতবা, স্লোগান ও কথোপকথন
- আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য শোক পালন
  আলী আসগার রেজওয়ানী
- হযরত আলী (আ.)-এর জীবনের স্মরণীয় কিছু বিষয়
  আল্লামা সাইয়্যেদ মোর্তাজা আসকারী
- কারবালার ইতিহাস ও 'বিষাদ সিন্ধু'র কাহিনী
  মো. আশিফুর রহমান
- দর্শনের যে কথা জানা হয়নি
  আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১০

প্রত্যাশা • একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক • বর্ষ ১, সংখ্যা ৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১০

بسم الله الرحمن الرحيم

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু

আল্লাহ্‌র নামে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

প্রত্যাশা

একটি মানব উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

বর্ষ ১, সংখ্যা ৩

অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১০

সম্পাদক	:	**এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর**
সহযোগী সম্পাদক	:	**ড. জহির উদ্দিন মাহমুদ**
নির্বাহী সম্পাদক	:	**মো. আশিফুর রহমান**
উপদেষ্টামণ্ডলী	:	মোহাম্মদ মুনীর হুসাইন খান
		মোহাম্মাদ আব্দুল কুদ্দুস বাদশা
		এস.এম. আশেক ইয়ামিন
প্রকাশক	:	মো. আশিকুর রহমান
প্রকাশকাল	:	কার্তিক-পৌষ ১৪১৭ বাং
		শাওয়াল ১৪৩১- মুহররম ১৪৩২ হি.
		অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১০ ইং
মূল্য	:	৫০ (পঞ্চাশ) টাকা
যোগাযোগের ঠিকানা	:	২৯৯, গাউসুল আযম মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫
ই-মেইল	:	prottasha.2010@yahoo.com

Prottasha (Vol. 1, No. 3, October-December, 2010), Editor: A.K.M. Anwarul Kabir; Associate Editor: Dr. Zahiruddin Mahmud; Executive Editor: Md. Asifur Rahman; Advisors: Mohammad Munir Hossain Khan, Mohammad Abdul Quddus Badsha, S.M. Asheque Yamin; Publisher: Md. Ashiqur Rahman; Address: 299, Gausul Azam Market, Nilkhet, Dhaka-1205; E-mail: prottasha.2010@yahoo.com

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ৫

আল কুরআনের আলোকে মানুষ ৯

মোহাম্মাদ জাওয়াদ রুদগার

মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্ব ১৫

সাইয়্যেদ আকবার সাইয়্যেদীনিয়া

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর রক্তরঞ্জিত শাহাদাত : প্রেক্ষিত, উদ্দেশ্য ও প্রভাব ২২

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কতিপয় খুতবা, স্লোগান ও কথোপকথন ৪২

আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য শোক পালন ৭২

আলী আসগার রেজওয়ানী

হযরত আলী (আ.)-এর জীবনের স্মরণীয় কিছু বিষয় ৮৫

আল্লামা সাইয়্যেদ মোর্তাজা আসকারী

কারবালার ইতিহাস ও 'বিষাদ সিন্ধু'র কাহিনী ৯৫

মো. আশিফুর রহমান

দর্শনের যে কথা জানা হয়নি ১০৮

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Prottasha

A Quarterly Journal of Human Development
Vol. 1, No. 3, October-December, 2010

Table of Contents

Editorial 5

Man in the Light of the holy Quran 9
Mohammad Zawad Rudgar

Divine Representation of Human Being 15
Sayyed Akbar Sayyedinia

Martyrdom of Imam Hossain (As.) :
Background, Objective and Impact 22
Abdul Quddus Badsha

Some Speeches, Slogans and Conversations of
Imam Hossain (As.) 42

Mourning for the Saints of Allah 72
Ali Asgar Rezwani

Some Memorable Events in the Life of Hazrat Ali (As.) 85
Allama Sayyed Murtaza Askari

History of Karbala and Story of
the Bishad Shindhu (Sea of Grief) 95
Md. Asifur Rahman

Unkhown part of Philosophy 108
Abdul Quddus Badsha

গ্রাহক চাঁদার হার		
	প্রতি কপি	বাৎসরিক
ডাকযোগে (পোস্টাল চার্জ সহ)	৬০ টাকা	২৪০ টাকা

ডাকযোগে পত্রিকা পেতে গ্রাহক চাঁদা মানি অর্ডার করে নিচের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে :

মো. আশিফুর রহমান
বাড়ি নং-৪ (পশ্চিম পাশ, নিচতলা), রোড নং-৩, ব্লক- সি, সেকশন-২, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সম্পাদকীয়

ইমাম হুসাইন (আ.) উত্তম আদর্শের প্রতীক

ইসলামের ইতিহাসের স্মরণীয় ঘটনাসমূহের মধ্যে কারবালার ঘটনা সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা। ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হযরত ইমাম হুসাইনকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা সংঘটিত হয়, যাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : 'হুসাইন আমা থেকে এবং আমি হুসাইন থেকে।' মহানবী (সা.)-এর এ বাণী আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে, যেমনভাবে তাঁর প্রতিটি কথা, কর্ম ও আচরণ উম্মতের জন্য অনুসরণীয় আদর্শ তেমনিভাবে ইমাম হুসাইনের প্রতিটি কথা, কর্ম ও আচরণও তাঁর উম্মতের জন্য আদর্শ। কেননা, তিনি যেমন উদ্দেশ্যহীন কোন কাজ করতে পারেন না, যে ব্যক্তি তাঁর থেকে, তিনিও উদ্দেশ্যহীন কোন কাজ করতে পারেন না। সুতরাং কারবালার ঘটনার পেছনেও অবশ্যই মহৎ উদ্দেশ্য ও দর্শন নিহিত রয়েছে।

ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্নের উদ্রেক হয়, কী এমন ঘটেছিল যে, মহানবী (সা.)-এর ওফাতের পর পঞ্চাশ বছর অতিক্রান্ত না হতেই তাঁরই উম্মত যারা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করত তাঁরই দৌহিত্র ও বংশধরদের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে এবং তাঁর পরিবারের নারী ও শিশুদের বন্দী করে ইসলামী ভূখণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে। অন্যদিকে আমরা লক্ষ্য করি, এ ঘটনার পেছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে বনি উমাইয়্যা যারা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রতিটি যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল এবং মক্কা বিজয়ের পর ইসলামের প্রভাব-প্রতিপত্তির সামনে পরাস্ত হয়ে বাহ্যিকভাবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এ গোষ্ঠীই মহানবী (সা.)-এর উত্তরাধিকারী হিসাবে ক্ষমতায় আরোহণ করেছিল এবং ইসলামের জন্য চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছিল। এ গোষ্ঠীর ব্যাপারেই রাসূল (সা.) বার বার হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন। অথচ মুসলিম উম্মাহ্র অজ্ঞতা, উদাসীনতা ও দুনিয়াপ্রেমের মত নৈতিক বিচ্যুতির সুযোগে তারাই মুসলমানদের নেতা হিসাবে আবির্ভূত হয়। তারা ইসলামী মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও মানবিক মর্যাদার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিষয়সমূহকে বিকৃত করে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টা চালায়। একদিকে তারা ইসলামের তাওহীদী বিশ্বাসে ইয়াহুদীবাদী চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিল, অপরদিকে মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিত্বকে চরমভাবে ক্ষুণ্ন ও তাঁর শত্রুদের ভিতকে মজবুত করার জন্য অসংখ্য জাল হাদিস তৈরি করেছিল এবং এভাবে ইসলামের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছিল। জাহেলিয়াতের নতুনভাবে প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছিল। কারণ, বদর, উহুদ, খন্দক ও অন্যান্য যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধশক্তি ইসলামের লেবাসে শুধু আবির্ভূতই হয়নি; বরং ইসলামের মূল পৃষ্ঠপোষক, ব্যাখ্যাকার ও মুখপাত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এমনকি তাদের কথা, কর্ম ও আচরণই ইসলাম বলে গণ্য হতে শুরু করেছিল। এ চিন্তাধারা ইসলামে বিকাশ লাভ করেছিল যে, খলিফা যা বলেন ও নির্দেশ দেন তা-ই ইসলাম। কারণ, তিনি পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ছায়া। যদি তাঁর কথা ও নির্দেশ কুরআন ও সুন্নাহ্‌র পরিপন্থীও হয়, তবু তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলা আল্লাহ্‌র বিরোধিতার শামিল এবং তাঁর কর্মের প্রতিবাদ করা অন্যায় ও নিষিদ্ধ। এ ধরনের চিন্তার ফলে খলিফার আনুগত্যের কোন সীমা-পরিসীমা ছিল না। এমনকি মহান ব্যক্তিদের হত্যা করা, পবিত্র কাবাগৃহে অগ্নিসংযোগ ও তা ধ্বংস করা সবই এ আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মুসলমানদের মৃতদেহ থেকে শির বিচ্ছিন্ন করে ইসলামী ভূখণ্ডের সর্বত্র ঘুরিয়ে বেড়ানোর মত জঘন্য আচরণও খলিফার আনুগত্যের জন্য বৈধ বলে গণ্য হত। অথচ ইসলাম কোন কাফের ও মুশরিকের মৃতদেহের সাথেও এরূপ আচরণকে অনুমোদন করে না।

এ সকল আচরণ বনি উমাইয়্যার অভ্যন্তরীণ কলুষ বা কালিমার ক্ষুদ্র এক চিত্র মাত্র। অপরদিকে সাধারণ জনগণের মধ্যেও ইসলামী চেতনা ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পূর্ণরূপে বিলীন হয়ে গিয়েছিল। ফলে তারা শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হাসিলের হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। অবস্থা এতটা সঙ্গীন হয়ে পড়েছিল যে, বনি উমাইয়্যা রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে চরিত্রহীন ও লম্পট ব্যক্তিকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার দুঃসাহস দেখাতে পেরেছিল। ইমাম হুসাইন (আ.) তৎকালীন শাসকের অবস্থা এ বাণীতে তুলে ধরেছেন : 'নিশ্চয় ইয়াযীদ পাপাচারী ও মদ্যপায়ী, যাদেরকে হত্যা করা নিষেধ তাদের হত্যাকারী। আমার মত কেউ কখনই তার মত লোকের আনুগত্য করতে পারে না।... যদি মুসলিম উম্মাহ্‌ ইয়াযীদের মত একজন শাসকের আনুগত্য করে তবে ইসলামকে চিরবিদায় জানাতে হবে।'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মুসলমানদের এ অবস্থায় করণীয় সম্পর্কে ইমাম হুসাইনের বক্তব্য ছিল : 'তোমরা কি দেখছ না সত্য ও ন্যায়ের ভিত্তিতে কাজ করা হচ্ছে না? যখন সত্য প্রত্যাখ্যাত এবং মিথ্যা ও বাতিল সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক হয়েছে তখন যে কোন মুমিনের উচিত শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করা ও আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎকে স্বাগত জানানো।'

ইমাম হুসাইনের এসব বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইসলাম সম্পূর্ণরূপে বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়েছিল এবং শাসকগোষ্ঠী ইসলামের বিধি-বিধানের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধাবোধ রাখত না। ইমাম হুসাইন (আ.) দেখলেন মুসলিম উম্মাহ্‌কে এরূপ তিমিরাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে উদ্ধার এবং ইসলামকে রক্ষা করতে হলে ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী যে অবৈধ এবং তাদের আনুগত্য যে ইসলামে অসমর্থিত তা স্পষ্টভাবে জনসমক্ষে তুলে ধরা আবশ্যক। শুধু তা-ই নয়, এ ধরনের শাসকের সঙ্গে বেঁচে থাকাও যে কোন মুমিনের জন্য কাঙ্ক্ষিত নয়, তিনি সকলের মধ্যে সে চেতনা জাগ্রত করার প্রয়াস চালান। তিনি তাঁর আন্দোলন শুরু করেন।

অবশেষে জালেম ইয়াযীদের নির্দেশে ত্রিশ হাজার সৈন্য কারবালায় ইমাম হুসাইনকে অবরোধ করে এবং বাহাত্তর জন সঙ্গীসহ তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এরপর তাঁদের সকলের শির বিচ্ছিন্ন করে ইয়াযীদের নিকট প্রেরণ করা হয়। তাঁর পরিবারের নারী ও শিশুদের বন্দী করে ইরাক ও সিরিয়ায় ঘোরানো হয়। এভাবে উমাইয়্যাদের ইসলামের বাহ্যিক লেবাস খুলে পড়ে এবং তাদের আসল চেহারা উন্মোচিত হয়। মুসলিম উম্মাহ্‌ ইমাম হুসাইনকে সহযোগিতা না করলেও এ ঘটনার পর তাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের উদাসীনতা ও অবহেলার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। বনি উমাইয়্যারও শাসনের পতনের সূচনা হয়। ইমাম হুসাইনের এ আন্দোলনের মধ্যে একদিকে সত্য, ন্যায় ও ইসলামের পক্ষের শক্তির মধ্যে এ অনুপ্রেরণাদায়ক আদর্শ রয়েছে যে, যদি কোন সমাজে সত্য ও ন্যায় উপেক্ষিত এবং অন্যায়-অবিচার ও শোষণের নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার প্রতিবাদ করতে হবে। অন্যদিকে এর বিরোধী শক্তির জন্যও এ সতর্কবাণী রয়েছে যে, শক্তি প্রয়োগ করে হয়ত সত্যপন্থীদের হত্যা করা যায়, কিন্তু সত্যকে কখনই নিশ্চিহ্ন করা যায় না। তাই ইমাম হুসাইনকে স্মরণ করার অর্থ সত্য ও ন্যায়কেই স্মরণ করা। এজন্য তাঁর শিক্ষাকে চির জাগরুক রাখার জন্য আমাদের প্রয়াস চালাতে হবে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল কুরআনের আলোকে মানুষ

মোহাম্মাদ জাওয়াদ রুদগার*

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

দাসত্ব ও আনুগত্য

কুরআনের দৃষ্টিতে সে-ই হল প্রকৃত মানুষ যে স্রষ্টাকে চিনেছে, স্রষ্টা সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন ও ইসলামী শিক্ষায় প্রশিক্ষিত হওয়ার কারণে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্‌র দাসত্বকে মেনে নিয়েছে এবং তাঁর নবী (সা.) ও মনোনীত ওয়ালীদের (স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি) আনুগত্যকে নিজের জন্য অপরিহার্য জ্ঞান করেছে।

আল্লাহ্‌র নিকট পূর্ণ আত্মসমর্পণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন বলছে :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلۡمِ كَآفَّةً ...

'হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমরা সকলেই পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের আওতায় প্রবেশ কর... ।'[১]

এ আত্মসমর্পণের দাবি হল মানুষ বুদ্ধিবৃত্তিক ও চিন্তাগত, আন্তরিক ও অভ্যন্তরীণ সর্বোপরি সমগ্র অস্তিত্ব নিয়ে আল্লাহ্‌র নিকট আত্মসমর্পণ করবে। কুরআনের দৃষ্টিতে সে-ই হল মুসলমান যে আল্লাহ্‌র নির্দেশের সম্পূর্ণ অনুগত। সে ধর্মীয় মূল্যবোধ, বিধানসমূহ ও ঐশী সীমারেখার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এ কারণে শরীয়ত তার ওপর যে

---

*ইরানের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দায়িত্ব অর্পণ করেছে সে তা যথাযথভাবে পালন করে। দাসত্বের অর্থও হল মানুষ তার উপাস্যের প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত থাকবে এবং কখনই নিজেকে তাঁর থেকে অমুখাপেক্ষী জ্ঞান করবে না ও দায়িত্বমুক্ত মনে করবে না; বরং সে তার পূর্ণতার পথে যতই অগ্রসর হবে ততই ঐশী বিধি-বিধানের বোঝা তার ওপর ভারী হতে থাকে এবং আরও অধিক দায়িত্ব তার ওপর অর্পিত হতে থাকে। (যেমনভাবে ফরজ-ওয়াজিবের পাশাপাশি মুস্তাহাব ও নফল ইবাদাতসমূহ পালন তার জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়, তেমনিভাবে হারাম ছাড়াও মাকরূহ ও এমন কাজ যা মাকরূহ না হলেও তার মর্যাদার পরিপন্থী ও উৎকর্ষের গতিকে স্তিমিত বা মন্থর করে তা পরিহার করাও তার জন্য আবশ্যক হয়ে পড়ে।) আমরা মহানবী (সা.) ও তাঁর বংশের পবিত্র ইমামদের জীবনে আনুগত্যের এ উচ্চতর পর্যায়ের প্রকৃত নমুনা লক্ষ্য করি। তাঁদের বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে শরীয়তের বিধি-বিধানের প্রতি আনুগত্যের বিষয়টি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর শেষ জীবনে দায়িত্ব যতই বাড়ছিল তাঁর ইবাদাতের প্রতি অনুরাগ আরও বৃদ্ধি পাচ্ছিল। স্বয়ং আল্লাহ্ই তাঁকে এ নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۝٧ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ۝٨

'অতএব, যখনই অবসর পাও তখনই কঠোর সাধনায় রত হও।'[২]

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًا ۝٣

'সুতরাং তুমি তোমার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।'[৩]

যদিও রাসূল (সা.) ভুল-ত্রুটিমুক্ত ছিলেন, তদুপরি ঐশী পূর্ণতা ও স্রষ্টার অধিকতর নৈকট্য লাভের জন্য তাঁর ওপর ইবাদাতের ক্ষেত্রে কঠোর সাধনার নির্দেশ আরও তীব্র হয়েছিল। পূর্ণতার পথে তিনি দাসত্বের দায়িত্ব থেকে কখনই অব্যাহতি পাননি; বরং তাঁর ওপর এ দায়িত্ব কঠিনতর হয়েছে। তাই কুরআনের আলোকে মানুষের পূর্ণতার সঙ্গে দাসত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। হযরত আলী (আ.) ইসলামের সংজ্ঞায় বলেছেন : 'ইসলাম হল আত্মসমর্পণ। কিন্তু এ আত্মসমর্পণের নিম্নতম পর্যায়– ইসলাম গ্রহণ ও আনুগত্যের মৌখিক স্বীকৃতি– 'বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কেননা, এখনও ঈমান তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি'[৪] – যেমন রয়েছে, তেমনি সর্বোচ্চ পর্যায়ও– 'তোমরা মুসলমান না হয়ে (পূর্ণ আত্মসমর্পণকারী না হয়ে) মৃত্যুবরণ কর না'– রয়েছে।[৫] এ আয়াতগুলো নিঃসন্দেহে ইসলাম গ্রহণ, মুসলমান হওয়া, মুসলমান থাকা এবং মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা–ইসলামের এ বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায়ের প্রতি ইঙ্গিত করছে। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ সহজ হলেও প্রকৃত মুসলমানের ন্যায় জীবনযাপন করা ও এ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করা সহজ নয়। কারণ, এর জন্য বিধি-বিধানের অনুগত থাকতে হয়, প্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হয়, মানুষ ও জিন শয়তানদের প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রকে মোকাবিলা করতে হয়। তাই একজন মুসলমানকে সবসময় সচেতন থাকতে হয়। কুরআন সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলছে, 'নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাকে তোমরা শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর,[৬] 'এবং শয়তান যেন তোমাদের (সঠিক পথ থেকে) নিবৃত্ত না রাখে। নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'[৭] তাই কুরআনের আলোয় আলোকিত মানুষ শত্রু-সচেতন ও তার ষড়যন্ত্রের মোকাবিলায় আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণ করে। কুরআনের ভাষায়–

وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ نَزۡغٞ فَٱسۡتَعِذۡ بِٱللَّهِۚ إِنَّهُۥ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوۡاْ إِذَا مَسَّهُمۡ طَٰٓئِفٞ مِّنَ ٱلشَّيۡطَٰنِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبۡصِرُونَ ٢٠١

'এবং যদি শয়তানের পক্ষ থেকে কোন প্ররোচনা তোমাকে স্পর্শ করে তাহলে তুমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞানী। নিশ্চয় যারা সাবধানতা অবলম্বন করে (ও আত্মসংযমী হয়), যখন শয়তানের পক্ষ হতে কোন কুমন্ত্রণা তাদের আক্রান্ত করে, তখন তারা (আল্লাহ্‌কে) স্মরণ করে এ অবস্থায় যে, তারা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন হয়।'[৮]

সুতরাং ঐশী পথের যাত্রী এ মানুষ জানে শয়তান তাকে সঠিক-সরল পথ থেকে বিচ্যুত করে[৯] তার চিন্তা ও কর্মের ওপর পূর্ণ আধিপত্য স্থাপন করার জন্য সবসময় ওঁৎ পেতে রয়েছে।[১০] এভাবে সে মানুষকে নিজের দাসে পরিণত করতে চায়। তাই আত্মসমর্পিত মানুষ তার যাত্রাপথে যে কঠিন বিরোধিতা ও কষ্টসাধ্য প্রতিবন্ধকতার

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মুখোমুখি হয় তা অতিক্রমের লক্ষ্যে আল্লাহ্‌র দাসত্বের কঠোর সাধনায় রত হয় যাতে এভাবে তাঁর অভিভাবকত্বের ছায়ায় তাঁর রঙে রঞ্জিত হতে পারে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় 'আল্লাহ্‌র রঙ (গ্রহণ কর), আল্লাহ্‌র থেকে উত্তম রঙ কার রয়েছে? এবং আমরা তাঁরই ইবাদাতকারী।'[১১] যখন মানুষ ঐশী রঙ ধারণ করে তখন আল্লাহ্‌র সর্বময় কর্তৃত্বকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করে।

কুরআনের আদর্শ মানুষ আল্লাহ্‌র আনুগত্যের অনুগামী হিসাবে তাঁর রাসূল ও মনোনীত নির্দেশদাতাদের (উলিল আম্‌র) আনুগত্য করে। কারণ, আল্লাহ্‌র অভিভাবকত্বকে মানা তাঁর রাসূল ও মনোনীত ব্যক্তিদের মানার মধ্যেই নিহিত। এ নির্দেশ স্বয়ং আল্লাহ্‌ই দিয়েছেন। তিনি বলেন : 'হে ঈমানদার ব্যক্তিগণ! তোমরা আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে আদেশ দেওয়ার অধিকার রাখে (উলিল আম্‌র)।'[১২] অন্যত্র তিনি বলেছেন : 'তোমাদের অভিভাবক কেবল আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল এবং সেসব বিশ্বাসী ব্যক্তি যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে এবং রুকু অবস্থায় যাকাত দেয়।'[১৩]

এ আয়াতেও আল্লাহ্‌ নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ব্যক্তিদের অভিভাবক বলে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং তাঁদের আনুগত্য আল্লাহ্‌রই আনুগত্যের শামিল। আর আল্লাহ্‌র দাসত্বের দাবি হল এ ব্যক্তিবর্গকে অভিভাবক ও নেতা হিসাবে গ্রহণ ও তাঁদের নির্দেশ পালন।

সার্বিক পবিত্রতা

কুরআনের আলোয় উদ্ভাসিত মানুষ ওহীর (ঐশী প্রত্যাদেশের) পবিত্র ঝরনায় তার দেহ ও মনকে ধৌত ও সুবাসিত করে। তাই তার বিশ্বাস, কর্ম ও চরিত্র সকল বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কলুষ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। হযরত আলী (আ.)-এর ভাষায় : 'মানুষের মর্যাদা তার পবিত্রতার মধ্যে নিহিত এবং মানুষের সৌন্দর্য হল তার পৌরুষত্বে। এ ধরনের পবিত্রতা তার পূর্ণতা ও ঐশী নৈকট্যের কারণ বলে বিবেচিত হয় যা মানুষ ও বিশ্বের অভ্যন্তরে বিদ্যমান রহস্য উদ্ঘাটনে তাকে সাহায্য করে।'

রাসূল (সা.) বলেছেন : 'যদি আদম সন্তানদের হৃদয়ের চতুর্দিকে শয়তান পরিভ্রমণ না করত (অর্থাৎ সে আত্মিক পবিত্রতা অর্জন করত) তবে অবশ্যই সে বিশ্বমণ্ডলের পরিচালনা ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করত।'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কুরআনের আলোয় আলোকিত মানুষ পবিত্র চিন্তা ও কর্মের গণ্ডিতে প্রবেশের মাধ্যমে বিকশিত হয়ে নিজেই প্রশান্তি, সুগন্ধ ও নেয়ামতপূর্ণ বাগিচায় পরিণত হয়েছে। পবিত্র কুরআন তাদের সম্পর্কে বলছে : 'যদি সে (আল্লাহ্‌র) নৈকট্যপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে (যেন) সে প্রশান্তিকর, সুবাসিত ও নেয়ামতপূর্ণ উদ্যান।'[১৪]

মহানবী (সা.) বলেছেন : 'নিরবচ্ছিন্ন পবিত্রতা তোমাদের জন্য অবিরাম জীবিকার নিশ্চয়তা বয়ে আনে।'[১৫]

এ হাদিসে পবিত্রতা বলতে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ উভয় ধরনের পবিত্রতার কথা বলা হয়েছে এবং জীবিকার বিষয়টিও বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় প্রকারকে শামিল করে। ইরফানী (আধ্যাত্মিক) পরিভাষায়, এ পবিত্রতা ক্ষুদ্র পবিত্রতা (বাহ্যিক ও দৈহিক পবিত্রতা), মধ্যবর্তী পবিত্রতা (মন্দ প্রবৃত্তি ও অনৈতিক বিষয়সমূহ থেকে মুক্ত থাকা) এবং বৃহৎ পবিত্রতা (আল্লাহ্‌ ব্যতীত সকল কিছুর স্মরণ থেকে বিস্মৃত হয়ে তাঁর প্রতি মনোনিবেশ– যাকে একান্তভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি মনোযোগী হওয়ার ব্যাপারে সকল প্রকার উদাসীনতা হতে পবিত্রতা বলা যায়) অর্থাৎ তিন শ্রেণীর পবিত্রতাকেই অন্তর্ভুক্ত করে। পবিত্রতার সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছতে যেমনভাবে অজ্ঞতা, স্থবিরতা, গোঁড়ামি, কুসংস্কার, বিকৃতি, বিচ্যুতি, পশ্চাদগামিতাসহ সকল প্রকার জ্ঞানগত ও চিন্তাগত ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তেমনি হিংসা, বিদ্বেষ, কৃপণতা, শত্রুতা, লোক দেখানো সৎকর্ম, কপটতাসহ অনৈতিক সকল ব্যাধি থেকেও আরোগ্য লাভ অপরিহার্য। এমনকি তাকে আল্লাহ্‌র সার্বক্ষণিক স্মরণের মাধ্যমে তাঁর থেকে মুহূর্তের জন্যও অমনোযোগী না হওয়ার উচ্চতম পবিত্রতাও অর্জন করতে হবে।

সুতরাং যে ব্যক্তি জ্ঞানগত, চরিত্রগত এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ের পবিত্রতা অর্জন করে তার সামনে থেকে সকল পর্দা উন্মোচিত হয়ে যায়। বিশেষ করে যখন আমিত্বের পর্দা বান্দার সামনে থেকে উন্মোচিত হয় তখন তার ও স্রষ্টার মধ্যে নৈকট্যের ক্ষেত্রে কোন ব্যবধান থাকে না। ইমাম বাকির (আ.) ও ইমাম কাযিম (আ.)-এর নিকট থেকে বর্ণিত হয়েছে : 'মহান ও পবিত্র সত্তা আল্লাহ্‌ ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে স্বয়ং সৃষ্টি (বান্দার আত্মপ্রেম ও স্বার্থপরতা) ছাড়া কোন পর্দা নেই।'[১৬]

হযরত আলী (আ.) বলেছেন : 'তোমরা তোমাদের আত্মাকে কামনা-বাসনার পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র কর, তাহলেই তোমরা উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে পারবে।'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কুরআনের কাঙ্ক্ষিত মানুষ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব দর্শনের অপবিত্রতা হতে মুক্ত। আয়াতুল্লাহ্ জাওয়াদী আমুলী এ সম্পর্কে বলেন, 'পবিত্রতার প্রকারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন দর্শন থেকে আত্মার পবিত্রতা।' কুরআনের শিক্ষায় প্রশিক্ষিত মানুষ তার সমগ্র জীবনে এ পবিত্রতা ধরে রাখতে সচেষ্ট থাকে। সে তার পরিশুদ্ধ হৃদয়, আলোকিত বুদ্ধিবৃত্তি ও পবিত্র সহজাত তাওহীদী সত্তাকে–যা ঐশী আমানত বলে গণ্য– সকল প্রকার কলুষ ও কালিমা থেকে মুক্ত রাখে। সে যেভাবে পবিত্র ও নিষ্পাপ অবস্থায় দুনিয়াতে এসেছিল ঠিক সেরূপ পবিত্র ও নিষ্পাপভাবেই দুনিয়া থেকে পরবর্তী জগতে প্রবেশ করে।

(চলবে)

অনুবাদ : এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর

তথ্যসূত্র

১. সূরা বাকারা : ২০৮
২. সূরা আল ইনশিরাহ : ৭-৮
৩. সূরা আন নাস্‌র : ৩
৪. সূরা হুজুরাত : ১৪
৫. সূরা আলে ইমরান : ১০২
৬. সূরা ফাতির : ৬
৭. সূরা যুখরুফ : ৬২
৮. সূরা আরাফ : ২০০-২০১
৯. সূরা মুজাদালা : ১৯
১০. সূরা আরাফ : ১৬
১১. সূরা বাকারা : ১৩৮
১২. সূরা নিসা : ৫৯
১৩. সূরা মায়েদা : ৫৫
১৪. সূরা ওয়াকিয়া : ৮৮-৮৯
১৫. বিহারুল আনওয়ার, আল্লামা মাজলিসী, ১০৫তম খ-, পৃ. ১৬
১৬. বিহারুল আনওয়ার, ৩য় খ-, পৃ. ৩২৭, হাদীস নং ২৭

(তেহরান থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'কাবাসাত', ১২তম বর্ষ ২য় সংখ্যা থেকে অনূদিত)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্ব

সাইয়্যেদ আকবার সাইয়্যেদীনিয়া

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

খেলাফতের প্রকারভেদ

মোটামুটিভাবে খেলাফতকে তিনভাগে ভাগ করা যায় :

১. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্ব (বস্তুজগতের প্রতিনিধিত্ব);
২. বিধানগত বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব ও
৩. অতিপ্রাকৃতিক বাস্তব বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব (অবস্তুজাগতিক প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব) ।

কখনও কখনও প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি দৃশ্যমান বস্তুসমূহের ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয় । যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে :

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ خِلۡفَةً...

'আর তিনি (আল্লাহ্) হলেন সেই সত্তা যিনি রাত্রি ও দিবসকে একে অপরের স্থলাভিষিক্ত করেছেন... ।'[১]

কখনও কখনও প্রণীত কোন বিষয়ে স্থলাভিষিক্তের বিষয়টি উত্থাপিত হয় । যেমন মহান আল্লাহ্ বলেন : 'হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত করেছি, সুতরাং মানুষের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে বিচার কর ।' আবার কখনও স্থলাভিষিক্তের বিষয়টি অতি প্রাকৃতিক বাস্তব বিষয়ে প্রযোজ্য । যেমনটি হযরত আদম (আ.)-এর ঐশী প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে হয়েছে– যা সূরা বাকারার ৩০ নং আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে ।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পবিত্র কুরআনে মানুষের প্রতিনিধিত্ব বাস্তবভিত্তিক ও সত্তাগত এক প্রতিনিধিত্ব। পূর্ণ মানব সৃষ্টিগত পূর্ণতার সকল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই তার প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি সত্তাবহির্ভূত আরোপিত বা প্রণীত কোন কিছু নয়। আমরা এ পর্যায়ে মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্বের প্রকৃত অর্থ ও স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করব।

একদিকে মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি একটি প্রকৃত ও সত্তাগত বিষয়, নিছক প্রণীত ও বিধানগত বিষয় নয় (যেমনটি মানুষের মধ্যে বিচার করা ও তাকে দিক নির্দেশনা দানের দায়িত্ব লাভের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে), অন্যদিকে মানুষের সৃষ্টিগত প্রতিনিধিত্বের অর্থ হল আল্লাহ্‌র ঐশী নামসমূহের প্রকাশস্থল হওয়া ও তার মাধ্যমে স্রষ্টার গুণাবলির প্রকাশ ঘটা অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক সৃষ্টিগত কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া। সুতরাং মানুষের এ স্থলাভিষিক্তের অপরিহার্য অর্থ হল অস্তিত্ব জগতে সৃষ্টিগতভাবে সে ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হবে। মহান আল্লাহ্‌ মানুষকে এ মর্যাদা দান করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতে সৃষ্টিগতভাবে তার ইচ্ছার প্রয়োগ করতে পারে। প্রতিনিধিকে অবশ্যই সে যার প্রতিনিধিত্ব করছে বা স্থলাভিষিক্ত হয়েছে তার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে হবে অর্থাৎ তার আলোর প্রতিচ্ছবি ও প্রতিবিম্ব হতে হবে।

মানুষ ঐশী গুণাবলির প্রকাশস্থল। অসীম হওয়ার কারণে যে সত্তার প্রকৃত স্বরূপ মানুষ কর্তৃক অনুধাবন করা অসম্ভব, অস্তিত্বসমূহের মধ্যে সে সত্তার এমন এক অস্তিত্ব থাকবে যা ঐ ঐশী সত্তার প্রকাশস্থল হবে এবং ঐশী আলোকমালার অন্যতম হিসাবে স্রষ্টার নিদর্শনধারী দিক নির্দেশক অস্তিত্ব হবে। এ বৈশিষ্ট্য অর্জনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপাদান হল ঐশী নামসমূহ সম্পর্কে অবহিতি যা তাকে সমগ্র অস্তিত্ব জগতের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করে এবং অন্য সকল সৃষ্টিকে তার সামনে নত করে।

আল্লামা হাসানযাদেহ আমূলী ঐশী প্রতিনিধিত্বের বিষয়ে বলেন : 'পবিত্র কুরআনের إِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً 'নিশ্চয়ই আমি পৃথিবীতে স্থলাভিষিক্ত নির্ধারণকারী'– আয়াত অনুযায়ী ঐশী নামসমূহের বহুত্বের বিষয়টি এবং প্রতিনিধি ও স্থলাভিষিক্ত সত্তা কর্তৃক প্রতিনিধিত্ব দানকারী সত্তার বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিকারী হওয়া পৃথিবীতে পূর্ণ মানবের অস্তিত্বের অপরিহার্যতা ও অব্যাহত থাকার বিষয়টিকে প্রমাণ করে। অর্থাৎ সকল অবস্থায় ও সময়ে বিশ্বজগতে বিদ্যমান অস্তিত্বসমূহের মধ্যে পূর্ণতম এমন সত্তার অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য যা অস্তিত্বজগতের সকল নাম ও পূর্ণতার (সৌন্দর্য ও শক্তিমত্তার) বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে যাতে সে ঐশী সত্তার স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হতে পারে। যেমন মহান আল্লাহ্‌র এক ও অদ্বিতীয় হওয়ার বিষয়টি পূর্ণতার ক্ষেত্রে তাঁর সত্তার একত্বের প্রমাণবাহী, তেমনি মানবজাতির পূর্ণতম ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির মধ্যে ঐশী পূর্ণ সত্তার নমুনা ও নিদর্শন (প্রকাশস্থল) থাকতে হবে যা পূর্ণতার ক্ষেত্রে অদ্বিতীয় ও অনুপম।'

ইমাম খোমেইনী (রহ.) ঐশী খেলাফতের অর্থ, স্বরূপ ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে বলেন : 'যখন অন্তঃকরণের অভ্যন্তরে এ বিষয়টি প্রকাশিত হয় যে, ঐ অদৃশ্য বাস্তব সত্তা সকল গভীর দৃষ্টিধারীর চিন্তার এতটা ঊর্ধ্বে যে, কেউই তাঁর পবিত্র সান্নিধ্য থেকে কিছু লাভে সক্ষম নয় এবং নাম ও বৈশিষ্ট্যসমূহ তাদের নির্দিষ্ট ও অস্তিত্বগত স্বাতন্ত্র্যের কারণে তাঁর গোপনীয়তার একান্ত সঙ্গী নয় এবং উল্লিখিত সত্তাসমূহ (নাম ও বৈশিষ্ট্যসমূহ) তাঁর গোপন বিষয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার অনুমতিপ্রাপ্ত নয়, তখন নামসমূহের প্রকাশ হওয়া ও মহান আল্লাহ্‌র ভাণ্ডারের গোপন রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য অদৃশ্য জগতের ঐশী স্থলাভিষিক্ত ও প্রতিনিধি প্রয়োজন যে নামসমূহকে প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিনিধি হবে এবং তাঁর আলোকে দর্পণসমূহকে প্রতিফলিত করবে এবং এর মাধ্যমে অনুদানের ও অনুগ্রহের দ্বারসমূহ উন্মোচিত হবে এবং কল্যাণের ফল্গুধারা প্রবাহিত হবে অর্থাৎ আদির ঊষা প্রতিভাত হবে এবং প্রারম্ভের সাথে সমাপ্তির যোগসূত্র সৃষ্টি হবে। এ কারণেই অদৃশ্যের উৎস থেকে অদৃশ্য কণ্ঠে বৃহত্তম পর্দা ও পূর্ণতম আলোকের পবিত্রতম কিরণ ও বিচ্ছুরণের প্রতি নির্দেশ হল নামসমূহ ও গুণাবলির পোশাক ও স্বাতন্ত্র্যের আবরণে প্রকাশিত হওয়ার। তখন সে তাঁর নির্দেশ পালন করল ও অদৃশ্যের নির্দেশকে বাস্তবায়িত করল।'

ইমাম খোমেইনী (রহ.) অন্যত্র বলেন : 'খেলাফতের (ঐশী প্রতিনিধিত্বের) প্রকৃত স্বরূপ হল সত্তাগত নির্ভরতা বা নিরঙ্কুশ দারিদ্র্য যার প্রতি তিনি (রাসূল সা.) 'দারিদ্র আমার অহংকার' বাণীটিতে ইঙ্গিত করেছেন।'

সমগ্র বিশ্বজগৎ (পূর্ণ) মানবের অধীন এবং তার সামনে অবনত ও তার ইচ্ছার অধীন। তেমনি সমগ্র সৃষ্টি তার অস্তিত্বের ছায়ায় রয়েছে। এ সম্পর্কে ইমাম খোমেইনী বলেন : 'এটি তার স্বীয় স্থানে প্রমাণিত যে, পূর্ণ মানবের অপরিবর্তনীয় স্থায়ী রূপ হল আল্লাহ্‌র মহৎ নামের প্রকাশস্থল যা নির্দেশক ও পরিচালক শীর্ষস্থানীয় নামসমূহের পুরোধা। অন্যান্য অস্তিত্বের রূপসমূহ জ্ঞান ও রূপসমূহের জগতে পূর্ণ মানবের রূপের ছায়ায় রূপ লাভ করে ও বাস্তব জগতে অস্তিত্ব লাভ করে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সুতরাং সমগ্র অস্তিত্ব বলয়ের রূপসমূহ রূপসমূহের জগতে পূর্ণ মানবের রূপের প্রকাশস্থল এবং প্রকাশমান জগতে বিদ্যমান সৃষ্টিসমূহ তাঁর সত্তার সৌন্দর্য ও শক্তির প্রতিচ্ছবি ও প্রকাশিত রূপ।

মানুষের ঐশী প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতার মানদণ্ড

এ সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ভাবার্থ থেকে বোঝা যায় হযরত আদম (আ.)-এর ঐশী খেলাফত প্রাপ্তির যোগ্যতার মানদণ্ড ছিল ঐশী নামসমূহ সম্পর্কে তাঁর অবহিতি। যেমন নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে :

وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٣١﴾

'আর তিনি (আল্লাহ্) আদমকে নামসমূহ শিক্ষা দিলেন, অতঃপর তাকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন এবং বললেন : আমাকে এ নামসমূহ সম্পর্কে অবগত কর যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।'[২]

এ আয়াত থেকে বোঝা যায় হযরত আদম (আ.)-এর ঐশী প্রতিনিধিত্বের মানদণ্ড ছিল নামসমূহ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান যে জ্ঞান ফেরেশতাদের ছিল না। যথার্থভাবে বললে ফেরেশতারা তাঁদের মহা পবিত্রতা ও মহান মর্যাদা সত্ত্বেও সে জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতা রাখতেন না। আল্লামা তাবাতাবায়ী এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছেন : 'হযরত আদম (আ.) নামসমূহ সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান থাকার কারণেই ঐশী প্রতিনিধিত্ব লাভ করেন, শুধু সে সম্পর্কে খবর দানের কারণে নয়।'

নামসমূহ শিক্ষাদানের অর্থ

পবিত্র কুরআনে 'নামসমূহ' কী এবং তার স্বরূপ কী সে বিষয়ে স্পষ্ট বর্ণনা আসেনি। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায়, উক্ত নামসমূহ মানুষের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

নামকরণের মত কোনো বিষয় ছিল না। তাই এ নামসমূহ শিক্ষাদানের অর্থ কিছু শব্দ ও বর্ণমালার মাধ্যমে মস্তিষ্ক পূর্ণ করা নয়; বরং এর অর্থ বস্তুগত প্রকৃত পরিচয়, সত্তা ও স্বরূপ সম্পর্কে অবহিতি এবং ঐশী নামসমূহ সম্পর্কে আত্মনির্ভর দিব্য জ্ঞান (علم شهودي)।

নামসমূহ কী এ সম্পর্কে বিভিন্ন মত বর্ণিত হয়েছে। যেমন :

ক. হযরত কাতাদা বলেন : 'নামসমূহ বলতে আলোচ্য সত্তার অর্থ ও বাস্তবতাকে (স্বরূপকে) বুঝানো হয়েছে। কারণ, নিঃসন্দেহে শুধু নাম জানা ও শব্দমালাকে মুখস্ত করার মধ্যে কোন মর্যাদা নেই। তাই আলোচ্য সত্তাসমূহের অর্থ ও স্বরূপকে জানাই এখানে উদ্দেশ্য। যখন মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে হযরত আদম (আ.) অন্তর্নিহিত কারণ বর্ণনা করলেন তখন ফেরেশতারা স্বীকার করলেন যে, এ বিষয়ে তাঁরা অবগত নন এবং আল্লাহ্ তাঁদের না জানালে তাঁরা সে সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন না।'

খ. হযরত ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে যুবাইর এবং অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে নামসমূহ বলতে সকল পেশা, শিল্পকর্ম, কৃষিকাজের মূলনীতি, উদ্যানতত্ত্ব, বৈষয়িক ও পারলৌকিক (ধর্মীয়) জ্ঞান বুঝানো হয়েছে।

গ. কেউ কেউ বলেছেন, তখন পর্যন্ত সৃষ্ট এবং ভবিষ্যতে সৃষ্টি হবে এমন সব বস্তুর নাম হযরত আদমকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল।

ঘ. হযরত আলী ইবনে ঈসা বলেন : 'হযরত আদম (আ.)-এর সন্তানরা তাঁর নিকট থেকে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করেছিলেন এবং তাঁরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার পর যে যে ভাষা শিক্ষা লাভ করেছিলেন ও তা বলতে অভ্যস্ত ছিলেন সে ভাষায় কথা বলতেন, তবে তাঁরা কমবেশি সকল ভাষা সম্পর্কেই অবহিত ছিলেন ও কথা বলতে পারতেন। কিন্তু হযরত নূহ (আ.)-এর বন্যার সময় অধিকাংশ মানুষ মৃত্যুবরণ করলে জীবিতদের যারা যে ভাষায় পারদর্শিতা রাখত শুধু সে ভাষায়ই কথা বলতে শুরু করল। ফলে অনেক ভাষা হারিয়ে গেল।

ঙ. কোন কোন বর্ণনায় (আহলে বাইতের সূত্রে বর্ণিত হাদীসে) নামসমূহ বলতে নবিগণ এবং চৌদ্দজন মাসুমকে (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত ফাতিমা সহ বারো জন পবিত্র ইমাম) বুঝানো হয়েছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কোন কোন মুফাস্‌সির বিশ্বাস করেন নামসমূহ বলতে ফেরেশতাদের ও ঊর্ধ্বজগতের সাথে সম্পর্কিত বিষয় যা সম্পর্কে ফেরেশতারাও অবহিত নন এবং এ নামসমূহের জগৎ সকল বস্তু এবং সত্তার মূল ও উৎস। প্রকৃতপক্ষে এ জগতের সকল কিছু ঐ জগতের অবনমিত ও স্তিমিত রূপ। নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে :

وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآئِنُهُۥ وَمَا نُنَزِّلُهُۥٓ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢١﴾

'এমন কিছু নেই যার ভাণ্ডার আমাদের নিকট বিদ্যমান নয় এবং আমরা তা থেকে নির্ধারিত পরিমাণেই শুধু অবতীর্ণ করি।'[৩]

আয়াতুল্লাহ জাওয়াদী আমূলী মহান আল্লাহ্‌র নামসমূহ সম্পর্কে বলেন : 'নামসমূহ বলতে বিশ্বজগতের অদৃশ্য বাস্তবতা বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ্‌র নিদর্শন ও প্রতীক স্বরূপ হওয়ার কারণেই তাকে 'ইস্‌ম' বা নাম বলা হয়েছে। এ নামসমূহ বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞানসম্পন্ন এমন এক বাস্তব সত্তা যা অদৃশ্য জগতে (পর্দার অন্তরালে) রয়েছে এবং মহান আল্লাহ্‌র নিকট সংরক্ষিত। তারা জগতের বস্তুসমূহের ভাণ্ডার এবং এ কারণেই দৃশ্যমান ও অদৃশ্য উভয় জগতের সকল বস্তুকে ধারণ করছে। এ সত্তার সাথে পরিচিত হওয়ার অর্থ যেমন এর বাস্তবতার পরিচয়বাহী চিন্তাগত একটি রূপের সাথে পরিচিতি তেমনি ঐ নামসমূহের সাথে পরিচিতি যা ঐ চিন্তাগত রূপকে প্রকাশ করে। তাই প্রথমটিকে নামসমূহ এবং দ্বিতীয়টিকে নামসমূহের নাম বলা যায়।'

ছ. কারও কারও মতে নামসমূহের অর্থ আল্লাহ্‌র সুন্দরতম নামসমূহ যার মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি হয়েছে।

জ. কেউ কেউ নামসমূহ বলতে আল্লাহ্‌র নাম, বস্তুসমূহ ও ফেরেশতাদের নামসমূহ বুঝানো হয়েছে বলেছেন।

নামসমূহের বৈশিষ্ট্যাবলি

সূরা বাকারার ৩১ নং আয়াতে উল্লিখিত নামসমূহের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলা যায় :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১. এ নামসমূহ মহান আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্কিত অর্থাৎ তারা আল্লাহ্‌র নামসমূহের ও জগৎসমূহের প্রকাশস্থল এবং বিশ্বজগতের বাস্তবতা ও প্রকৃত রূপ প্রকাশিত ঐশী রূপেরই নাম।

২. এ নামসমূহ অদৃশ্য জগতের সাথে সম্পর্কিত, দৃশ্যমান জগতের অংশ নয়। কারণ, মহান আল্লাহ্‌ ফেরেশতাগণ কর্তৃক অক্ষমতা প্রকাশের পর বলেন :

أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّيٓ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ...

'আমি কি তোমাদের বলিনি যে, নিশ্চয় আমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অদৃশ্যের জ্ঞান রাখি...।'[৪]

৩. নামসমূহ হল অদৃশ্য জগতের ভাণ্ডার।

৪. নামসমূহ বলতে বাস্তব এক অস্তিত্ব বুঝানো হয়েছে, তা চিন্তা ও ধারণাগত কোন বিষয় বা শব্দাবলি নয়।

৫. আল্লাহ্‌র নামসমূহ নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় এ অর্থে যে, প্রতিটি নাম ও বাস্তবতাই কার্যকারণ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট অবস্থানে স্থায়ীভাবে বিদ্যমান এবং তাদের সকলের নির্দিষ্ট অস্তিত্বগত পর্যায় অথবা নির্দিষ্ট প্রকাশ রয়েছে।

৬. এ নামসমূহ নিখাদ কল্যাণ বৈ কিছু নয় এবং তা সকল প্রকার ত্রুটিমুক্ত।

৭. এ নামসমূহ আল্লাহ্‌ যাঁদের পরিশুদ্ধ করেছেন ও নিজের জন্য মনোনীত করেছেন তাঁদের ব্যতীত অন্যদের নাগালের বাইরে।

(চলবে)

অনুবাদ : এ.কে.এম. আনোয়ারুল কবীর

তথ্যসূত্র

১. সূরা ফুরকান : ৬২
২. সূরা বাকারা : ৩১
৩. সূরা হিজ্‌র : ২১
৪. সূরা বাকারা : ৩৩

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর রক্তরঞ্জিত শাহাদাত : প্রেক্ষিত, উদ্দেশ্য ও প্রভাব

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পরিচিতি

চতুর্থ হিজরির ৩ শাবান মদীনা মুনাওয়ারায় বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর প্রাণপ্রিয় দুহিতা হযরত ফাতেমা (আ.)-এর কোলে জন্মগ্রহণ করে এক পুত্রসন্তান।[১] যাঁর জন্ম কেবল বিস্ময়কর ও অসাধারণই ছিল না, তাঁর গোটা জীবনকাল ও গৌরবময় শাহাদাত ছিল অশেষ রহস্যে পরিপূর্ণ। তাঁর মাতা যদি সক্ষম হতেন তাহলে তাঁকে দুধ পান করাতেন। ইমাম হুসাইন (আ.) তাঁর নানা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর জিহ্বা ও আঙ্গুল চুষেই পরিতৃপ্ত হতেন, শান্ত হয়ে যেতেন।[২]

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইমাম হুসাইনকে কাঁধে বসাতেন এবং বলতেন : 'এ বালক ও তার ভাই দুনিয়ায় আমার দু'টি সুগন্ধী ফুল (রায়হান)।'[৩] তিনি বারবার বলতেন : 'হুসাইন আমা থেকে, আর আমি হুসাইন থেকে।'[৪] আরও বলতেন : 'এরা দু'ভাই আমার আহলে বাইতের মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয়।'[৫] রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের সম্পর্কে বলতেন : 'হাসান ও হুসাইন বেহেশতের যুবকদের নেতা।'[৬]

ইমাম হুসাইন (আ.) ইসলামের মহাবিদ্যালয়ে অর্থাৎ যে গৃহে জিবরীল (আ.) আয়াত নিয়ে অবতীর্ণ হতেন সেখানেই মহানবী (সা.)-এর পবিত্র কোলে এবং হযরত আলী ইবনে আবি তালিবের সান্নিধ্যে ও মা ফাতেমা যাহরার পবিত্র আঁচলের ছায়াতলে বড় হন। তাঁর শিক্ষার উচ্চ থেকে উচ্চতর স্তরে উত্তীর্ণ হন এ বিশ্ববিদ্যালয়েই। তাঁরই সহপাঠীবৃন্দ, যেমন হযরত সালমান ফারসি, হযরত মিকদাদ, হযরত আবু যার, হযরত ইবনে আব্বাস প্রমুখ তাঁর চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন, কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে তাঁর চেয়ে পিছিয়ে ছিলেন। যেমনটা আমরা জানি যে, ইবনে আব্বাস তাঁর নেতৃত্বে চলাকে নিজের জন্য গৌরবের কারণ বলে মনে করতেন এবং নিজেকে সৌভাগ্যবান

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ভাবতেন।[৭] হযরত আবু হুরায়রা তাঁর পবিত্র পদধূলি নিজের জামা দিয়ে মুছেছেন এবং এ কাজের জন্য গর্বও করেছেন।[৮] তিনি বর্ণনা করেছেন : 'আমি স্বচক্ষে দেখেছি যে, হুসাইন তার দু' পা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বুকের ওপরে রেখেছিল। আর রাসূল তাঁর জিহ্বায় চুমু দিচ্ছিলেন ও বলছিলেন : اللهم احبه فاني احبه 'হে আল্লাহ্! একে তুমি ভালবাস। কেননা, আমি একে ভালবাসি।'[৯]

ইমাম হুসাইন (আ.) হযরত আবু বকরের খেলাফতকালে যদিও মাত্র দশ বছরের এক বালক ছিলেন, তদুপরি বুজুর্গ সাহাবীবৃন্দের ফতোয়া ও জ্ঞান শিক্ষার আসরে অংশগ্রহণ করতেন।[১০] সাহাবীবর্গ তাঁকে নিজেদের জায়গায় এনে বসাতেন এবং তাঁর প্রতি এতটা শ্রদ্ধা প্রকাশ করতেন যা আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর কিম্বা আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের প্রতি করতেন না। ইমাম হুসাইন (আ.) এমন এক গৃহে বেড়ে ওঠেন যে গৃহের অধিবাসীবৃন্দ (আহলে বাইত অর্থাৎ মহানবীর গৃহের অধিবাসী) সর্বস্ব ধর্মের পথে উৎসর্গ করতেন এবং এ পথে তাঁদের কোন রকম কার্পণ্য বা ভণ্ডামি ছিল না।

ইবনে আসাকির তাঁর তারীখে কাবীর গ্রন্থে, আহমাদ ইবনে সুলায়মান তাঁর ইকদুল লিয়ালী গ্রন্থে, মুবাররাদ তাঁর কিতাবে কামিল-এ, ফাখরুদ্দীন রাযী তাঁর তাফসীরে و علم آدم الاسماء (এবং আদমকে শিক্ষা দিলেন নামসমূহ)-এ আয়াতের ব্যাখ্যায়, মুহসিনুল হুসাইনী তাঁর লাওয়ায়িজুল আশজান গ্রন্থে, ইবনে কুতাইবা তাঁর উয়ুনুল আখবার গ্রন্থে, ইয়াকুত মুস্তাওসী তাঁর আল-জাওয়ায়িব গ্রন্থে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর বদান্যতা ও দানশীলতার শত শত কাহিনী বর্ণনা করেছেন, যেগুলো আগেকার দিনে মানুষের মুখে মুখে উদাহরণ হিসাবে উচ্চারিত হত। ইমাম হুসাইন (আ.) পূর্ণতা ও পবিত্রতার এমন চরম শিখরে পৌঁছেছিলেন যে, মুবাহালার সেই অগ্নি পরীক্ষায় নাসারাদের বিরুদ্ধে তিনি দ্যুতিময় চেহারা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। বিশ্বের সকল ঐতিহাসিকের অকপট স্বীকারোক্তি মোতাবেক ইমাম হুসাইন (আ.) জ্ঞান, সংযমশীলতা, সত্যনিষ্ঠতা, সাহসিকতা, পরোপকার, দরিদ্রদের পাশে দাঁড়ানো ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর সময়ের মুসলমানদের মাঝে হুজ্জাত (দলিল-প্রমাণ) ও আদর্শের প্রতীক ছিলেন। সকলের আশ্রয়স্থলও ছিলেন তিনি। যেমনটা 'আল হাসান ওয়াল হুসাইন' গ্রন্থে লেখা হয়েছে : 'সবদিক বিচারে তিনি তাঁর নানা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে সবচেয়ে বেশি সদৃশ ছিলেন।'[১১]

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর নিকট থেকে অনেক প্রসিদ্ধ দোয়া, অগণিত কারামাত ও অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। তাঁর প্রতি ভক্তদের নিরন্তর দরূদ, ভালবাসার প্রেমাশ্রু, অশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রেরিত হয়ে আসছে। প্রতিদিন অসংখ্য মুসলমান তাঁর মাযারকে যিয়ারত করছে, সেই পবিত্র নাম মুসলমানদের অন্তরে চির জাগরুক

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রয়েছে। এক কথায় তিনি অশেষ ও অফুরন্ত বন্দনা ও প্রশংসায় অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। মনে হয় ইমাম হুসাইন (আ.) তাঁর নিজের পরিচয় তাঁর শাহাদাতের পূর্ব মুহূর্তে এ একটি বাক্যের মাধ্যমেই সবচেয়ে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন : 'হে আল্লাহ্! তুমি জান যে, এরপর জমিনের বুকে তোমার নবী-দুহিতার কোন পুত্রই আর রইল না।'

বনি উমাইয়্যার পরিচয়

আরবের কোন গোত্রই বনি উমাইয়্যার মত স্বার্থপর ও অহঙ্কারী ছিল না। এ গোত্র বেড়েই উঠেছিল উগ্র স্বভাব, স্বার্থান্বেষী মনোবৃত্তি, বিলাসিতা ও আনন্দ-ফূর্তির কুশিক্ষা নিয়ে। জাহেলী যুগে এরা ছিল অর্থসম্পদ, শাসনক্ষমতা ও পদমর্যাদার কাঙ্গাল। ইসলামের আগমনের পর দীর্ঘ একুশ বছর এ গোত্র ইসলামের প্রধান ও প্রকাশ্য শত্রু বলে গণ্য হয়েছে এবং ইসলামকে ধ্বংসের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। মক্কা বিজয়ের পর এ গোত্র পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলে রাসূল (সা.) তাদের 'তোলাকা' (মুক্ত যুদ্ধবন্দী) বলে ঘোষণা করেন। আবু সুফিয়ান ছিল এ গোত্রের প্রধান। তাদের পূর্বোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের কথা চিন্তা করে মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে আবু সুফিয়ানের মর্যাদা বৃদ্ধি পায় এমন কোন কিছু করতে হযরত আব্বাস রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন। রাসূল পরে তার গৃহকে নিরাপদ বলে ঘোষণা করেন। আর বনি উমাইয়্যার অর্থসম্পদের প্রতি মোহ থাকার কারণেই রাসূলুল্লাহ্ (সা.) গনীমতের মাল থেকে তাদেরকে অধিক হারে দান করতেন। উদাহরণস্বরূপ মক্কা বিজয়ের পর যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাদের অন্যতম আবু সুফিয়ানের পুত্র মু'আবিয়াকে হুনাইন যুদ্ধের গনীমত, যেগুলো নতুন মুসলমান ও দুর্বল ঈমানদারদের অন্তর জয় করার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল অর্থাৎ 'মুয়াল্লাফাতি কুলুবিহিম'-এর অংশ ছিল তা হতে একশ' উট এবং বিপুল পরিমাণ রূপা প্রদান করা হয়। পরে তিনি মদীনায় গমন করেন এবং দুই বছরের কিছু বেশি সময় রাসূলের সাহচর্য লাভ করেন।[১২]

মানবের সুন্দর ও উন্নত চারিত্রিক গুণাবলির কোন কিছুই এ গোত্রের লোকদের মধ্যে ছিল না। ইসলামের আবির্ভাবের পরও তারা দুনিয়াবী ফায়দা নেই এমন কোন কাজে আত্মনিয়োগ করতে রাজি ছিল না। ইসলাম তাদের কাছে একটাই অর্থ বহন করত। আর তা হল বনি উমাইয়্যার ওপর বনি হাশিমের কর্তৃত্ব ও প্রভাব বিস্তার এবং রাসূলের নবুওয়াতকেও তারা এ দৃষ্টিতেই দেখত। ইসলামের ইতিহাসে এ কথার পক্ষে অনেক সাক্ষ্য রয়েছে। যখন আবু সুফিয়ান হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর বিজয় ও

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মুসলিম সাম্রাজ্যের বিস্তার প্রত্যক্ষ করে তখন হযরত আব্বাস (রা.)-কে বলে : 'তোমার ভাতিজার রাজত্ব তো বিশাল রূপ ধারণ করেছে!' তাই প্রথম থেকেই তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ছিল এ কর্তৃত্বকে ছিনিয়ে এনে নিজেদের হস্তগত করা।

রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বনি উমাইয়্যার নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তিকে কোন প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত করতেন না। কিন্তু রাসূলের ওফাতের পর দামেশ্ক বিজিত হলে বনি উমাইয়্যা প্রশাসনিক পদ লাভ করে। দ্বিতীয় খলিফার সময় দীর্ঘ প্রায় দশ বছর মু'আবিয়া দামেশ্কের গভর্নর থাকায় তাঁর জন্য বনি উমাইয়্যাকে পৃষ্ঠপোষকতা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। হযরত উসমানের বার বছরের শাসনকালে তিনি আরও স্বাধীনতা লাভ করেন। কিন্তু যখন খেলাফত হযরত আলী (আ.)-এর হাতে আসে, তখন বনি উমাইয়্যা দীর্ঘদিনের প্রতিহিংসার আগুন প্রজ্বলন করে এবং হযরত ওসমানের রক্তের দোহাই দিয়ে ফেতনা ছড়াতে থাকে। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে মুহাজির ও আনসারদের ঐকমত্যে নির্বাচিত খলিফা আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের পটভূমি রচনা করে। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পবিত্র কুরআনকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে ও কুটচালের মাধ্যমে নিজেদের ক্ষমতাকে সরল মুসলমানদের সামনে বৈধ বলে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চালায় এবং সফলও হয়। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হিসাবে আলী (আ.)-এর পক্ষ থেকে নিয়োজিত গভর্নর ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথীদের হত্যার প্রক্রিয়া শুরু করে। যেমন তাঁর নিযুক্ত মিশরের গভর্নর মুহাম্মাদ ইবনে আবু বকরকে একটি মৃত গাধার চামড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে ও পুড়িয়ে এবং অপর ঘনিষ্ঠ সঙ্গী মালিক আশতারকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।[১৩]

একদিকে বনি উমাইয়্যারা নিজেদের প্রভাব জোরদার করার জন্য ধোঁকাবাজি, মিথ্যাচার আর খেয়ানতের মাধ্যমে দুর্বল ঈমানের অধিকারী গোত্রপতিদের খরিদ করতে থাকে। অন্যদিকে যিয়াদ ইবনে আবিহ, বুশর ইবনে আরতত প্রমুখের ন্যায় নিষ্ঠুর ব্যক্তিকে প্রশাসনিক দায়িত্ব দেয় যারা যে কোন ধরনের অত্যাচার ও নিপীড়নকে বৈধ জ্ঞান করত। প্রখ্যাত মুতাযিলী পণ্ডিত ইবনে আবিল হাদীদ নাহজুল বালাগার ব্যাখ্যা গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে লিখেছেন : 'মু'আবিয়া যিয়াদ ইবনে আবিহকে কুফা ও বসরার গভর্নর নিযুক্ত করে। সে যেহেতু হযরত আলী (আ.)-এর বন্ধুদের ভালভাবে চিনত, তাই তাদের এক-একজনকে ধরে হত্যা করত, তাদের চোখ উৎপাটন করে ফেলত এবং তাদের হাত-পা কেটে ফেলত।' তার এ জুলুম তার থেকে দূরে অবস্থানকারী হেজাজের জনগণকেও আতংকগ্রস্ত করে রেখেছিল। এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবেই মাইসামে তাম্মার, রুশাইদ হুজাইর, হুজর ইবনে আদি এবং আমর ইবনে হীমাক এর ন্যায় নিবেদিতপ্রাণ ও পরীক্ষিত নীতিবান মানুষকে হত্যা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করা হয়। এভাবেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের ক্ষোভকে তাদের বুকের মধ্যে বন্দী করে এবং আতংক ও সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে বনি উমাইয়্যা মানুষের জীবনকে ওষ্ঠাগত করে তোলে।

উমাইয়্যা আমলের জনজীবনের চিত্র

উমাইয়্যা আমলে সাধারণ জনজীবন, বিশেষ করে শাম ও মিশরের জনসাধারণের নৈতিকতার এত বেশি স্খলন হয় যে, বিখ্যাত ঐতিহাসিক মাসউদী এভাবে তার চিত্র তুলে ধরেন : 'তারা কোন অসঙ্গত কাজ থেকেই বিরত থাকত না, সঙ্গত ও সুন্দর বলে কিছুই তাদের সামনে মূল্য পেত না, তাদের যাতায়াত মক্তব ও পাঠশালার পরিবর্তে ছিল খেয়ালী যাদুকর ও মিথ্যা কাহিনীকারদের আখড়ায়। যদি কোন সমাবেশ ঘটত তবে সেটা ছিল হয় কাউকে চাবুক মারার অনুষ্ঠান অথবা কাউকে ফাঁসিতে ঝুলানোর অনুষ্ঠান। অকাজ-কুকাজেই তাদের ছিল সমস্ত অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ। আর সাধারণভাবে কুকাজকে সুকাজের সাথে এক করে দেখা হত। দীনদারকে কাফের বানাতে তাদের কোনই দ্বিধা ছিল না। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভাষায় যে বলা হয়েছে : এমন নড়বড়ে মানুষ যাদের ঈমান ছিল না, আবার বে-দীনও না। ঝুলন্ত ডালের মত, যা বাতাস যেদিক থেকে আসে, সেদিকেই দুলে যায়।'

ইমাম হুসাইন (আ.) তৎকালীন জনগণের নৈতিক অধঃপতনের প্রতি ইশারা করেছেন এভাবে :

و الله لخذل فيكم المعروف و قد شجت عليه عروقكم و توارت عليه اصولكم

'আল্লাহ্র কসম! হে জনগণ! যা কিছু উত্তম ও সঙ্গত তা তোমাদের মাঝে লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হয়েছে, আর তোমাদের জীবনের শিকড় গেড়েছে সেই লাঞ্ছনার ভূমিতলে।'[১৪]

অবস্থা এতটা শোচনীয় হয়েছিল যে, যখন উমাইয়্যা শাসনের পতন ঘটে ও আব্বাসীয় খলিফা আবুল আব্বাস সাফফাহ্ শামের ক্ষমতা দখল করে, তখন আবদুল্লাহ্ ইবনে আলী, শাম বাহিনীর নেতৃস্থানীয়দের ধরে সাফফাহ্র কাছে নিয়ে যায়। সে সময়ে তারা সকলে মিলে কসম করে বলতে থাকে যে, তারা বনি উমাইয়্যা ব্যতীত কাউকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আহলে বাইত (পরিবারের সদস্য) হিসাবে চিনত না![১৫]

ইতিহাসের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত এ ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বনি উমাইয়্যা কীভাবে জনসাধারণের অজ্ঞতা ও মূর্খতা কাজে লাগিয়ে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করেছে। তাদের অজ্ঞতা দিয়েই তাদের শোষণ করেছে এবং মিথ্যা, অপবাদ, আর বনি উমাইয়্যার নামে জাল হাদীস বানিয়ে আপামর জনসাধারণকে বোকা বানিয়েছে, তাদের আবেগ-অনুভূতিকে আহলে বাইতের বিরুদ্ধে ও হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর দীন রক্ষায় যাঁরা সত্যিকার আত্মত্যাগ করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলেছে। নিঃসন্দেহে সেদিন যদি উমাইয়্যা যুগের আলেম ও খতীবরা জনগণকে আলী (আ.) এর বিরুদ্ধে অভিসম্পাত বর্ষণ করার বুলি না শিখিয়ে ইসলামের সঠিক হুকুম-আহকাম ও দীনের দর্শন শিক্ষা দিত, তাহলে মানুষ এভাবে ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনকে বাদ দিয়ে বনি উমাইয়্যাকে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আহলে বাইত বলে চিনত না, কিম্বা আলীর অনুসারীদের 'কাফের' বা 'জিন্দীক' বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করত না।

কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার পর নবী-পরিবারের সদস্যদের বন্দী হয়ে শামে নীত হবার পর যখন এক বৃদ্ধ অবগত হয় যে, বন্দী হয়ে আসা লোকগুলো রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সন্তান, তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। কারণ, তার ধারণাও ছিল না যে, মহানবী (সা.)-এর কোন সন্তান বেঁচে রয়েছেন। হয়ত এ কারণেই ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) ইয়াযীদের দরবারে ভাষণ দানকালে সর্বপ্রথমে নিজের বংশ-পরিচয় তুলে ধরেছিলেন।

ইয়াযীদের পরিচয়

ইয়াযীদ জন্ম নেয় কলুষপূর্ণ এক পরিবেশে। তার মা 'মেইসুন'[১৬] ছিল ইয়াযদাল কালবির কন্যা। জন্মের পরই ইয়াযীদকে কাল্‌ব গোত্রের জনৈক খ্রিস্টান নারীর কাছে সোপর্দ করা হয়। তার লালন-পালনকারীরা ইসলাম সম্পর্কে কিছুই জানত না এবং তারা অশ্লীলতা ও নোংরামিতে অভ্যস্ত ছিল। অর্থাৎ নষ্টামি ও ধর্মবিবর্জিত এক পরিবারে সে লালিত-পালিত হয়।

তারা ইয়াযীদকে খ্রিস্টান রসম-রেওয়াজ অনুযায়ী লালন-পালন করে এবং মরু রীতি-নীতিতে অভ্যস্ত করে তোলে। ইয়াযীদের কুকুর নিয়ে খেলা, জুয়া, মদ্যপান, সহিংসতা, স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, বেপরোয়া ভাব, হত্যা, রক্তপাত, নারী-আসক্তি ইত্যাদি মানব চরিত্রের জন্য কলঙ্কজনক আরও অনেক কু-অভ্যাসের কথা সেদিন কারও অজানা ছিল না। ইয়াযীদের মুখ থেকে মদের গন্ধ নাকে আসা অবস্থায় একদা ইমাম হুসাইনের সম্মুখে এ কবিতা আবৃত্তি থেকে তার অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

الا يا صاح للعجب دعوتك ذا و لم تجب
الى الفتيات و الشهوات و الصاهباء و الطرب!

অর্থ : বন্ধু হে! আশ্চর্য হই যে, আমি তোমাকে ভোগ-বিলাস, মেলামেশা, আর উদগ্র বক্ষের কন্যাদের সাথে ফূর্তি করতে এবং নাফ্সের কামনা-বাসনা পূরণ ও নেশাকর মদ্যপান এবং নাচ-গানের প্রতি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, অথচ তুমি তা গ্রহণ করছ না?[১৭]

ইমাম হুসাইন (আ.) মুহূর্তেই সেখান থেকে উঠে চলে যান এবং বলেন : 'হে মু'আবিয়ার পুত্র! এ সব কাজ তোমারই সাজে।'

মূলত মু'আবিয়ার পুত্র ইয়াযীদের এভাবে লালন-পালন ছিল সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আনসারগণের ছেলেমেয়েদের লালন-পালন পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ এ অধঃপতন সত্ত্বেও মু'আবিয়া তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব খাটিয়ে শামের জনগণের কাছ থেকে ইয়াযীদের জন্য বাইয়াত আদায় করেন।[১৮]

ইয়াযীদ তার মনোভাব প্রকাশে কোন রাখঢাক রাখত না। সে প্রকাশ্যে এভাবে কবিতা আওড়াত :

لَيتَ اَشياخي بِبَدر شُهدوا وَقعه الخَزرج مِن دمع الاسل
لَعبـــت هاشم بالملك فلا خبر جـــاء ولا وحي نزل

অর্থ : হায়! যদি আমার পিতৃপুরুষরা বদরের ভূমি থেকে উঠে আসত এবং এ খাযরাজের (কুফার) ঘটনা দেখত! বনি হাশিম (মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধররা) তো রাজত্ব নিয়েই খেলেছে; আসলে না কোন খবর এসেছে, আর না কোন ওহী নাযিল হয়েছে![১৯]

যা হোক অদ্যাবধি কোন নীতিবান ঐতিহাসিকের সন্ধান পাওয়া যায় না, যিনি ইয়াযীদের কোন গুণের কথা লিখে থাকবেন।

ইয়াযীদকে খলিফা নির্বাচনের পদক্ষেপ

আমীর মু'আবিয়া ৫৯ হিজরিতে প্রথমে ঘরোয়া পরিবেশে ইয়াযীদের পক্ষে সমর্থন আদায় ও তা জাতীয়ভাবে উত্থাপন করার চেষ্টা চালান। এমনই এক ঘরোয়া পরিবেশে প্রথম যখন আমীর মু'আবিয়া ইয়াযীদের খেলাফতের কথা উত্থাপন করেন, তখন তার উচ্ছিষ্ট ভোগীদের মধ্য থেকে একে একে যাহ্হাক ইবনে কায়েস ফেহী, আবদুর রহমান ইবনে ওসমান, আবদুল্লাহ্ ইবনে মুসআদাহ্, ছওর ইবনে মুআন এবং

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আবদুল্লাহ্ ইবনে এসাম আশআরী মুখস্ত করা কথা ইয়াযীদের খেলাফতের সমর্থনে বলতে লাগল। তাদের বক্তব্যের সারমর্ম ছিল : যেহেতু খেলাফতের পদে ইয়াযীদের চেয়ে যোগ্যতর আর কেউ নেই, কাজেই হে আমীর (মু'আবিয়া)! ইয়াযীদকেই যুবরাজ ঘোষণা করুন। এটাই ভেদাভেদ ও মতপার্থক্যের থেকে উত্তম কাজ।[২০] কিন্তু এ বৈঠকে আহনাফ ইবনে কায়েসও ছিলেন। তিনি আরবের একজন বিজ্ঞ ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তখন বলে উঠলেন : 'হে আমীর! জনগণ ভাল ও মন্দ সম্পর্কে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। আমাদের বয়স তো পার হয়ে গেছে। আপনি নিজে ভালভাবে জানেন যে, আপনার পরে খেলাফত কার প্রাপ্য। যারা ইয়াযীদকে যুবরাজ করার ব্যাপারে আপনাকে উস্কে দিচ্ছে, তাতে আপনি গর্বিত হবেন না। আপনি অবগত যে, যতদিন হুসাইন জীবিত থাকবেন, ততদিন এটা মেনে নেবে না।'

আহনাফ পুনর্বার বলেন : 'হে মু'আবিয়া! আপনি নিজেই জানেন যে, আপনি যুদ্ধের মাধ্যমে ইরাক জয় করেননি। ইমাম হাসানের সাথে আপনার যে সন্ধি হয়েছিল তার একটি শর্ত ছিল যে, আপনার পরে কাউকেই মুসলমানদের খলিফা বানাবার অধিকার আপনার থাকবে না। খেলাফত তাঁর হাতেই তুলে দেবেন। আল্লাহ্র কসম! যদি এক চুল পরিমাণও বিচ্যুত হন তাহলে তাঁর আস্তিনের নিচে হাতসমূহ দেখতে পাবেন যেগুলো তাঁর বাইয়াতে আবদ্ধ এবং তাঁকে যে কোন প্রকার সাহায্য করতে প্রস্তুত। সেদিন যে তলোয়ারসমূহ সিফ্ফিনের ময়দানে আলীর জন্য আপনার বিরুদ্ধে শান দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো এখনও তাদের কাঁধে ঝুলানো আছে এবং আপনার বিরুদ্ধে ঘৃণায় যেসব অন্তর সেদিন পূর্ণ ছিল, আজও তা তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রবহমান রয়েছে...।' কিন্তু দুঃখজনক হল সেদিনের বৈঠক শেষ হয় জনাব মু'আবিয়ার অনুচর যাহ্হাকের এ কথার মাধ্যমে যে, মত প্রকাশের অধিকার শুধু উমাইয়্যা বংশের লোকদেরই রয়েছে। ইরাকবাসীর কোন কথা বলার অনুমতি নেই। তাদের নিঃশ্বাসকে তাদের বুকের ভেতরেই দাফন করতে হবে...।[২১] মু'আবিয়া আহনাফের কথা উপেক্ষা করে ইয়াযীদকে যুবরাজ হিসাবে ঘোষণা করলেন। এভাবেই তিনি খেলাফতকে রাজতন্ত্রে পরিণত করেন এবং একে তাঁর বংশের জন্য উত্তরাধিকারের বিষয়ে পরিণত করেন। শিয়া-সুন্নী উভয় সূত্র মতে, মু'আবিয়া ক্ষমতাকে তাঁর বংশগত করার লক্ষ্যে যারা খেলাফতের দাবিদার হতে পারে তাদের ওপর কঠোরতা আরোপ শুরু করেন।[২২]

ইমাম হাসান (আ.)-এর শাহাদাতের কিছুদিন অতিবাহিত না হতেই আমীর মু'আবিয়া শামের জনগণের নিকট থেকে ইয়াযীদের খেলাফতের নামে বাইয়াত গ্রহণ করেন। এরপর মদীনায় মারওয়ান ইবনে হাকামের কাছে চিঠি লিখে নির্দেশ দেন মদীনার নেতৃবৃন্দের কাছ থেকেও বাইয়াত আদায় করতে।[২৩] মারওয়ান যখন দেখল হেজাজের লোকেরা ইয়াযীদের বাইয়াত করছে না তখন সে তা মু'আবিয়াকে লিখে পাঠায়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমীর মু'আবিয়া তৎক্ষণাৎ মারওয়ানের স্থলে সা'দ ইবনে আসকে নিয়োগ করে। এবার সে মু'আবিয়ার নির্দেশ পালনে তৎপর হয়। কিন্তু জনগণ মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বনি উমাইয়্যা ছাড়া আর কেউ বাইয়াত করল না।[২৪]

তখন মু'আবিয়া ইয়াযীদের আনুগত্য মেনে নেয়ার জন্য আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর, আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর এবং ইমাম হুসাইন (আ.)-এর নিকট চিঠি পাঠান। কিন্তু তাঁরা সকলেই বাইয়াত করতে অস্বীকৃতি জানান। তখন মু'আবিয়া হজ্ব ও ওমরার অজুহাতে উমাইয়্যা গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে নিয়ে সশস্ত্র লোকজনের প্রহরায় হেজাজে আসেন। সেখানে আনসার ও মুহাজিরদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ও তাঁদের সন্তানদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন এবং নিজের অযোগ্য পুত্রকে যুবরাজ বানাবার ঘোষণা দেন।[২৫]

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর প্রতিবাদ

ইমাম হুসাইন (আ.) বেশ কিছু কাল ধরে উমাইয়্যাদের চিন্তাধারার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। প্রায়ই তিনি বিপদ সংকেত ঘোষণা করতেন এবং বলতেন : 'নিজের নীরবতার জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাই।'[২৬] কেননা, ইমাম জানতেন যে, কুরআন ও ইসলামের টিকে থাকা নির্ভর করছে তাঁর আত্মত্যাগ ও শাহাদাতের ওপর। কারণ, বনি উমাইয়্যা ইসলাম বলতে রাজত্ব ও ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুই বুঝেনি। তাদের যাবতীয় শত্রচতা ও মিত্রতা ছিল দুনিয়াকে পাওয়ার লক্ষ্যে এবং অনেক বক্র চিন্তার লোকের মতই তারাও মনে করত যে, শরীয়ত প্রবর্তনকারীরা ধর্মকে নেতৃত্ব ও রাজত্ব করার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

ইয়াযীদ যেমন অন্তরে ধর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখত না, তেমনি বাহ্যিকভাবেও তা মেনে চলত না। কিন্তু ইমাম হুসাইন (আ.) ছিলেন ঈমান ও হাকীকতের বাস্তব প্রতীক এবং দীনের প্রতি গভীর বিশ্বাস তাঁর সমস্ত শিরা-উপশিরায় বেগবান রক্তের মত ঢেউ খেলে যেত। তিনি ভাল করেই মু'আবিয়ার দুরভিসন্ধি বুঝলেন এবং এক অগ্নিঝরা ভাষণের মাধ্যমে তাঁর নীল নকশাকে প্রকাশ করে দিলেন।[২৭] তিনি তাঁর ভাষণে বলেন :

'হে মু'আবিয়া! ... সত্যিই কি তুমি জনগণকে ইয়াযীদের বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে নিক্ষেপ করতে চাও? যখন তার চরিত্রই তার উত্তম পরিচয়। তার চিন্তাচেতনা ও অভিমত তার কাজেই প্রকাশিত। তুমি ইয়াযীদ সম্পর্কে এবং আলে মুহাম্মাদ (সা.)-এর ওপর তার কর্তৃত্বের ব্যাপারে যা ঘোষণা করেছ, তা আমি শুনেছি! তাহলে আস,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এ ইয়াযীদকে কুকুর, বানর, কবুতর, নারী-আসক্তি ও ফূর্তিবাজি সম্পর্কে পরীক্ষা করে দেখ... ।

হে মু'আবিয়া! শুনেছি যে, তুমি আমাদের প্রতিও ইশারা করেছ । আল্লাহ্‌র কসম করে বলছি, মহানবী (সা.) তাঁর বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের জন্যই উত্তরাধিকার হিসাবে রেখে গেছেন ।

হে মু'আবিয়া! কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড–যেখানে যোগ্যতম লোকদের থাকা দরকার, সেখানে তাদেরকে বর্জন করছ এবং একজন পাপাচারী ও সম্ভোগে বুঁদ হয়ে থাকা লোককে অগ্রগণ্য করছ?'

মু'আবিয়ার মৃত্যুর পর ইয়াযীদ খলিফা হলে ইমাম হুসাইন (আ.) এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে তার হাতে বাইয়াত করতে অস্বীকার করার মাধ্যমে নিজেকে একজন আত্মত্যাগী বীরের বেশে মৃত্যুর ঝুঁকিতে ফেলেন । কারণ, তিনি ভাল করেই জানতেন যে, ইসলামের যে চারাগাছ আজ শুকিয়ে মুষড়ে পড়েছে, তা কেবল তাঁরই পবিত্র রক্তের অমিয় সিঞ্চনে পুনরায় সতেজ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে । কিন্তু এ আত্মোৎসর্গ বিশ্বে হক ও বাতিলের মধ্যকার এক অবিশ্রান্ত সংগ্রাম হিসাবেই প্রতিফলিত হতে হবে । যাতে মুসলিম রাজ্যে শাসনকর্তাদের জুলুম-অত্যাচার ও জনগণকে গোলামে পরিণত করার চক্রান্তের মূলোৎপাটন করা সম্ভব হয় । ফলে, আরও একবার মুসলমান জনপদে পরহেযগার, খোদাভীরু, লড়াকু সৈনিকদের শক্তিমত্তা– যা উমাইয়্যা অত্যাচারের ঘূর্ণিপাকে আটকা পড়েছিল– তা উজ্জীবিত হয়ে উঠবে ।

ঘটনা বাস্তবে এমনই ঘটেছিল । ইমাম হুসাইন (আ.) নিজের চোখে দেখে যেতে পারেননি, কিন্তু অচিরেই তাঁর এ আত্মদান এমনভাবে ফলবান হয়ে বিদ্যুৎগতিতে নগরে প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, খোদ ইয়াযীদের দারুল খোলাফাও তা থেকে নিস্তার পায়নি । এ কারণে তারই পুত্র উমাইয়্যা গোত্রের শত্রুতাপূর্ণ কর্মকাণ্ডের কারণে স্বীয় পদ থেকে ইস্তফা দেয় এবং বলে : 'আমি কখনই খেলাফতকে তার আহল (হকদার) থেকে বাধা দেব না ।'[২৮]

প্রস্তুত ইমাম হুসাইন (আ.)

ইসলাম জিহাদ তথা বিদ্রোহের অনুমতি দেয় কয়েকটি শর্ত ও প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতে । এসব শর্ত হল :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১. সকল অভিজ্ঞ ব্যক্তি, বিশেষ করে বিদ্রোহকারী ব্যক্তির কাছে নিশ্চিত হতে হবে যে, আল্লাহ্‌র হুকুম প্রকাশ্যে লঙ্ঘন করা হচ্ছে এবং জুলুম, অন্যায় ও অত্যাচার সর্বত্র ছেয়ে গেছে।

২. সাধারণ জনগণের সমর্থন বিদ্রোহ ও জিহাদের নেতৃত্বদানকারীদের অনুকূলে থাকবে, যদিও তাদের হাত-পা বাঁধা থাকে এবং তাদের মত প্রকাশের অধিকার বুকের ভেতরেই চাপা পড়ে যায়।

৩. ইবনে খালদুনের মতানুসারে যে ব্যক্তি বিদ্রোহ ও জিহাদের নেতৃত্ব প্রদান করবে তাকে সে যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে।

৪. জুলুম ও খোদাদ্রোহিতা প্রতিরোধের জন্য যুদ্ধ ও আত্মদান ছাড়া বিকল্প পথ না থাকা।

আমরা মনে করি যে, ইমাম হুসাইন (আ.) এর উত্তর দিয়েছেন স্বয়ং তাঁর নানা রাসূলের ভাষ্য থেকেই। পরিস্থিতির মূল্যায়ন এবং কর্তব্য নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা.) থেকে এ বাণীটি উল্লেখ করেছিলেন :

يا ايها الناس! ان رسول الله (ص) قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا بعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل في عباده بالاثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل و لا قولك ان حقا على الله ان يدخله مدخله. الا و ان هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمن و ظهروا الفساد و عطلوا الحدود و استأثروا بالفى و احلوا الله حرام الله و حرموا حلاله و انا احق من غيرى.

'হে জনগণ! নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন স্বৈরাচারী শাসককে দেখে, যে আল্লাহ্‌র হারামগুলোকে হালাল করে এবং তাঁর হালালগুলোকে হারাম করে, আল্লাহ্‌র সাথে ওয়াদাগুলো ভঙ্গ করে এবং রাসূলের সুন্নাহ্ অগ্রাহ্য করে এবং জাতি ও প্রজাদের সাথে পাপাচার ও অত্যাচারপূর্ণ আচরণ করে, অথচ তাকে নিজ কথা কিম্বা কর্ম দ্বারা পরিবর্তন করে দেয় না, তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র ন্যায্য অধিকার হল সেখানে তাকে নিক্ষেপ করবেন, যেখানে উক্ত স্বৈরাচারকে নিক্ষেপ করবেন। তোমরা কি দেখছ না যে, এরা (বনি উমাইয়্যা) শয়তানের আনুগত্যে লিপ্ত হয়েছে, আল্লাহ্‌র অনুগত্যকে বর্জন করেছে, আর ফাসাদকে প্রকাশ্য রূপ দিয়েছে এবং আল্লাহ্‌র বিধি-বিধানগুলো অকেজো করে রেখেছে। আর জনগণের বাইতুল মাল নিয়ে ফূর্তি ও বিলাসব্যসনে মগ্ন হয়েছে। এরা আল্লাহ্‌র হারামকে হালাল করেছে এবং তাঁর হালালকে হারাম করেছে। (জেনে রাখ) এদের প্রতিরোধ করার জন্য এবং

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ নির্দেশ বাস্তবায়নের জন্য আমি অন্যদের চেয়ে বেশি উপযুক্ত ও যোগ্য।'[২৯]

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে এ বিষয়ে যে, ইমাম হুসাইন (আ.) কেন মু'আবিয়ার আমলেই বিদ্রোহ করলেন না? আর ইয়াযীদের আমলে কেনই বা মু'আবিয়ার আমলের মত নীরব থাকলেন না? এর উত্তর হল, ইমাম হুসাইন (আ.) দূরদর্শিতার কারণেই মু'আবিয়ার শাসনামলে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েননি। এর অন্যতম কারণ ছিল মু'আবিয়ার অভূতপূর্ব চাতুর্যপূর্ণ শাসন-কৌশল। তিনি আলী ইবনে আবি তালিব (আ.)-এর বিরুদ্ধে রাজ্যময় অভিসম্পাত বর্ষণের প্রথা চালু করলেও এ কৌশলে কোন ভুল করেননি যে, ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কাছ থেকে বাইয়াত আদায়ে কড়াকড়ি করে নিজের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করবেন। কেননা, তাঁর আশপাশে ছিল আমর ইবনে আস ও মুগীরা ইবনে শুবার ন্যায় ধুরন্ধর কুটকৌশলীরা। যারা কাগজ ও কুরআনের মলাট উঁচু করে সিফ্ফিনের পরিণতি ঘুরিয়ে দিতে দ্বিধা করেনি। কিন্তু আজ ইয়াযীদের চারপাশে কজন রোমান গোলাম ছাড়া রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব কাউকে পাওয়া যায় না। এ কারণে তার পিতা যে ভুল করেননি, আনাড়ী ও ক্ষমতার মোহে অন্ধ ইয়াযীদ খেলাফতের মসনদ হাতে পেয়ে প্রথমেই সে ভুলে পা দেয়। নবী (সা.)-এর সন্তান হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-কে হয় আনুগত্য করতে হবে, নয়ত তাঁকে হত্যা করা হবে– এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

ইমাম হুসাইন (আ.) ইয়াযীদের নিকৃষ্ট পরিচয় এবং নিজের পূত-পবিত্র উৎকৃষ্ট পরিচয় উপস্থাপনপূর্বক সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন : مثلي لا يبايع مثل يزيد 'আমার মত ব্যক্তি ইয়াযীদের মত ব্যক্তির হাতে বাইয়াত করতে পারে না।'[৩০]

যে হুসাইন রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কোলে-পিঠে এবং মা ফাতেমার পবিত্র আঁচলে বড় হয়েছেন, তাঁর পক্ষে এরূপ পরিস্থিতিতে শান্ত হয়ে বসে থাকা কি সম্ভব ছিল? যখন তিনি দেখতে পাচ্ছেন, যে ইসলামকে প্রচার করার জন্য তাঁর নানা ও পিতা শরীরের রক্ত পানি করেছেন, সে ইসলাম একদল অধঃপতিত, বিচ্যুত ও সম্পূর্ণরূপে দুনিয়াপূজারী লোকের হাতে জিম্মী হয়ে পড়বে। যদি রুখে দেওয়া না হয় তাহলে যেসব উমাইয়্যা কুকর্ম ও অনাচার সমাজে রীতি হিসাবে চালু করা হয়েছে, অচিরেই সেগুলো কুরআন ও সুন্নাহর স্থান দখল করে নেবে এবং সেগুলোই নিখাদ ধর্মাচার বলে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। ইমাম হুসাইন দেখতে পাচ্ছেন জুলুমবাজ ও মুনাফিক লোকেরা ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করছে ও অপরাধ সংঘটিত করে উমাইয়্যা দরবারে আশ্রয় নিচ্ছে। তিনি লক্ষ্য করলেন, যে কঠিন বিচ্যুতি উমাইয়্যা শাসকদের ঘাড়ে চেপে বসেছে, তা ওয়াজ-নসিহতে অপসারিত হবে না। চোখের সামনেই ইমাম দেখছেন ধর্মভীরু পুণ্যবান লোকেরা উমাইয়্যা কুকর্মের বিরোধিতা করার ফলে একে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

একে কবরবাসী হচ্ছেন। বাইতুল মাল জনগণের কল্যাণে ব্যয় না হয়ে দরবারের লোকদের কামনা মেটানোর জন্য দাসী খরিদ করতে খরচ করা হচ্ছে। ওদিকে অনাহার-অর্ধাহারে হাজার হাজার মুসলমান মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে।

ইমাম দেখছেন যে, গোত্রপতিরা অনেকেই ভোগ-বিলাসে ডুবে আছে। আর যাদের মধ্যে এখনও এক চিলতে ঈমান অবশিষ্ট রয়েছে, তারা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মুখপানে চেয়ে রয়েছে। তাদের বক্তব্য, যদি হুসাইন (আ.) বিদ্রোহ না করেন, তাহলে আমরা কেন ধ্বংস হব? আর যদি আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকারের কাজ ওয়াজিব হয় তাহলে প্রথমে হুসাইন (আ.)-কেই তা পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

উমাইয়্যা গোত্রের অগণিত পাপাচার এ সত্যকে সবার সামনে স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে, তারা কেবল মুহাম্মাদ (সা.)-এরই শত্রু নয়; বরং জাহেলী যুগের বিদ্বেষ মোতাবেক এমনকি নবীবংশের একটা শিশুকেও জীবিত রাখবে না।

কর্তব্যের শহীদ ইমাম হুসাইন (আ.)

ইসলামের ভিত গড়ে উঠেছে কয়েকটি মূল জিনিসের ওপর, যার অন্যতম হল জিহাদ ও আত্মত্যাগ। কিন্তু ইমাম হুসাইন (আ.) দেখলেন, একমাত্র নবীর পরিবার ছাড়া আরবের সকল মুসলমানের মধ্য থেকে দীনের দরদ উবে গেছে। এদিকে ইয়াযীদও কুকর্মের কিছুই বাকি রাখেনি। আর ইমাম হুসাইন লক্ষ্য করলেন যে, নীরব থাকার কোনই সুযোগ নেই। এ কথার প্রমাণ মেলে স্বয়ং ইমাম (আ.)-এর দোয়ায়ে আরাফা'র উক্তি থেকে। দোয়ার ভাষায় তিনি বলেন : فقتلت مقهورا অর্থাৎ পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, হুসাইন ইসলাম রক্ষায় কুরবানী হলেন অনন্যোপায় হয়ে। ইমাম হুসাইন বাতিলের নিকষ অন্ধকারের বিপরীতে সত্যের আলোকোদ্ভাসিত চেহারা নিয়ে দাঁড়ালেন স্বীয় কর্তব্য পালন করতে। এ তো সর্বস্ব কুফ্‌রের বিরুদ্ধে সর্বস্ব ঈমানের আবির্ভাব; আর বিস্মৃতির অতলে ডুবে যাওয়া মুহাম্মাদী শিক্ষার সগৌরব প্রত্যাবর্তন। নানার দীনকে হায়েনার কবল থেকে রক্ষায় তিনি রুখে দাঁড়ালেন, শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে নিজের কথা রাখলেন এবং এ পথে তাঁর বুকের রক্ত কীভাবে বয়ে গেছে তা স্বচক্ষে অবলোকন করেছেন। দোয়ার ভাষায় তাই মাসূম ইমামগণ নিঃসঙ্কোচে ঘোষণা করেছেন :

بذل مهجه ليستنقذ عبادك من الضلالة

অর্থাৎ (হে আল্লাহ্!) তিনি (হুসাইন) তো তোমার রাহে স্বীয় বুকের রক্ত অকাতরে ঢেলে দিয়েছেন, যাতে তোমার বান্দারা গোমরাহী থেকে রক্ষা পায়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইমাম হুসাইন (আ.) বিদ্যমান ঘটনাবলির প্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত এ সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে, আত্মোৎসর্গই তাঁর কর্তব্য। তাঁর এ কর্তব্য পালনের কথা আমরা আশুরার রাতে ইমাম ও তাঁর সঙ্গীবৃন্দের কথোপকথন থেকে সন্দেহাতীতভাবে বুঝতে পারি। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তাঁরা সারারাত ধরে নিশ্চিন্তে ও পরম প্রশস্তি সহকারে কুরআন তেলাওয়াত আর নামায ও মোনাজাতে অতিবাহিত করেন। শাহাদাতের সুমধুর ঘ্রাণ তাঁরা স্পষ্টভাবে অনুভব করছিলেন। যখন ইমাম হুসাইন (আ.) তাঁদেরকে বললেন : তোমরা চলে যেতে পার। তাঁরা বলে উঠলেন : কোথায় যাব? আল্লাহ্‌র কসম, যদি হাজার বার নিহত হই, পুনরায় আমাদের জীবিত করে হত্যা করা হয়, তবুও আপনার সাথে জীবন উৎসর্গ করাকে বেঁচে থাকার ওপরে স্থান দেব।[৩১]

এ সময় মুসলমানদের অন্য সকল নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শাহাদাতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বেখবর ছিল। আবদুল্লাহ্ ইবনে যুবাইর মনে করতেন, ইরাক হল তাঁর জায়গা। এ কারণে তিনি প্রহর গুণতে থাকেন হুসাইন হেজাজ থেকে কখন চলে যান, যাতে তাঁর পথ পরিষ্কার হয়ে যায়। আর ইবনে আব্বাস, ইবনে জাফর, ইবনে ওমর এ ভাবনায় ছিলেন যে, তিনি কেবল হেজাজের জন্যই। তাই তাঁরা বলছিলেন, হুসাইনের হেজাজে থাকা উচিত যাতে তাঁর প্রস্থানের মাধ্যমে ইবনে যুবাইয়েরের চোখ উজ্জ্বল না হয়।

এদিকে ইবনে যিয়াদ মনে করছিল, ইমাম বুঝি কুফায় গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের সাথে জড়িত। তাই তার ধারণা ছিল তাঁকে হত্যা করার মাধ্যমে কুফার সত্যপন্থীদের অন্তরে ভালবাসার প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারবে।

আফসোস! কীসব সংকীর্ণ ভাবনা হুসাইনকে নিয়ে! আশ্চর্যের বিষয় হল এরা কেউই জানে না যে, হুসাইন এমন এক বিশাল ব্যক্তিত্বের নাম, কোন নির্দিষ্ট স্থান, কাল বা পাত্রের সাধ্য নেই তাঁকে ধারণ করার।

তবে কেন ক্রন্দন

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সপরিবারে শাহাদাত বরণের জন্য শোক ও মাতম করার মূল প্রোথিত রয়েছে ইতিহাসের গভীরে। মহান আম্বিয়ায়ে কেরাম, এমনকি আসমানের ফেরেশতাকুলও নিজ নিজ পন্থায় এ শহীদ ইমামের জন্যে আযাদারী করেছেন। রেওয়ায়েত অনুযায়ী আশুরার ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পরে চারদিকে আঁধার নেমে আসে এবং কারবালার আকাশ কালো ধুলোয় ভরে যায়। আর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সেখানকার নুড়ি পাথরগুলো, এমনকি জলের মাছগুলো চল্লিশ দিন ধরে ইমামের শোকে ক্রন্দন করতে থাকে।

انَّ السماء بكي عَلي مَصاب الْحُسين اَربَعين صَباحاً

'ইমাম হুসাইন (আ.)-এর মুসিবতে আকাশ চল্লিশ দিন ধরে ক্রন্দন করে।'[৩২]

ইমাম হুসাইন (আ.) এর জন্য আযাদারী পালন একটি প্রাচীন রীতি এবং আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.)-এর পক্ষ থেকে প্রবর্তিত বিষয়। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা.) ইমাম হুসাইনের ঠোঁটে এবং গলায় চুম্বন দিতেন এবং কাঁদতে কাঁদতে বলতেন :

انّي اقبل مواضع السيّوف

'আমি তলোয়ারের জায়গাগুলোতে চুম্বন করছি।'[৩৩]

হযরত ফাতিমা যাহরাকে হুসাইনের জন্য আযাদারী পালনের গুরুত্বের ব্যাপারে তিনি বলতেন :

يا فاطمه كُلّ عَيْن باكيَه يَوم الْقيامَه الاعين بكت عن مَصاب ا لْحسين فانها ضاحكه مستبشره بنعيم الجنه

'হে ফাতিমা! কিয়ামতের দিন প্রত্যেক চক্ষুই কাঁদতে থাকবে, কেবল সে চোখ ব্যতীত, যে হুসাইনের মুসিবতে ক্রন্দন করেছে। জান্নাতের নেয়ামতে পূর্ণ হয়ে সে আনন্দিত ও হাসিমুখে থাকবে।[৩৪]

হযরত আলী ইবনে আবি তালিবও আযাদারী ও ক্রন্দন করেছেন। এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত হল সিফ্ফিনে যাওয়ার পথে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে আমীরুল মুমিনীন আলী (আ.) যখন নাইনাওয়া (কারবালা) ভূমিতে পৌঁছেন, তখন ক্ষণিক যাত্রা বিরতি করে বিশ্রাম গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন। তিনিও অবতরণ করলেন। এরপর দু'হাত কারবালার উত্তপ্ত বালির ওপর রাখলেন এবং ক্রন্দন করলেন। সঙ্গীরা যখন ইমামের কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন তখন তিনি বললেন :

هٰهنا مناخ ركابهم ومسفك دمائهم ومحط رحالهم

'এ স্থানই তাদের বহনকারী জন্তুগুলোর থামার জায়গা এবং এখানেই তাদের রক্ত মাটিতে মিশবার জায়গা এবং তাদের মালামাল নামানোর জায়গা।'[৩৫]

এছাড়া ফাতিমা যাহরা (আ.) রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নিকট থেকে শিক্ষা নিয়ে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর দোলনা দোলানোর সময় থেকে নিজের শাহাদাতের মুহূর্ত পর্যন্ত সবসময় হুসাইনের মজলুম হওয়া ও নির্মমভাবে শহীদ হবার কথা স্মরণ করে ক্রন্দন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করতেন। আর কন্যা যায়নাবকে উপদেশ দিতেন যেন এ দুঃসময়ে তাঁর ভাইয়ের সঙ্গী হন।

স্বয়ং ইমাম হুসাইনও একাধিকবার কারবালার পথ অতিক্রম করার সময় মহা বিপদ সংঘটিত হওয়া মর্মে তাঁর প্রিয় নানা ও পিতার ভবিষ্যদ্বাণীর আলামতসমূহ প্রত্যক্ষ করে ক্রন্দন করেন। যেমন, যখন উবায়দুল্লাহ্‌র চিঠি দেখেন এবং হযরত মুসলিম ও হানির শাহাদাতের খবর পান এবং সেনাপতি হুরের দ্বারা যখন তাঁর পথ আটকে ধরা হয়। বর্ণিত হয়েছে যে, এসব ঘটনায় ইমাম হুসাইন (আ.) আয়াতে ইস্তিরজা (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহহি রাজেউন) পাঠ করেন। আর আশুরার রাতে সঙ্গী-সাথী ও পরিবারবর্গের মাঝে আযাদারী অনুষ্ঠান করেন, সন্তানদের থেকে বিদায় গ্রহণ করেন এবং এক বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বনি হাশিমের একেক জন যুবকের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং ক্রন্দন করছিলেন। ساعَةً فَنَظَرَ اليهم ثُمَّ بكي 'তিনি তাঁদের দিকে তাকালেন। তারপর কিছুক্ষণ ধরে ক্রন্দন করলেন।'[৩৬] তিনি পবিরারবর্গকেও বলেন তাঁর জন্য ক্রন্দন করতে। বিশেষ করে বোন যায়নাব ও প্রাণপ্রিয় পুত্র যায়নুল আবেদীন (আ.)-কে নির্দেশ দেন তাঁর শাহাদাতের পর যেন বন্দী অবস্থায় চলার পথে যেখানেই যাত্রাবিরতি করা হবে, সেখানে তাঁর মজলুম হওয়ার কথা বর্ণনা করা হয় এবং জনগণের বিশেষ করে শামের জনগণের কানে তা পৌঁছানো হয়। এছাড়াও তিনি তাঁর অনুসারীদের আশুরার শোক পালন ও আযাদারী অনুষ্ঠান করার মাধ্যমে তা ভবিষ্যতের মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দেন। শোকাশ্রু বিসর্জন করা এবং আশুরার দিনে তাঁর মুসিবতের কথা স্মরণ করে আযাদারী পালন করার মধ্যে যে বার্তা নিহিত রয়েছে, সেটা বুঝাতে তিনি বলেছেন :

انا قتيل العبره قتلت مكروباً فلا يذكرني مؤمن الّا بكي

'আমি অশ্রুর শহীদ, আমি নিহত হয়েছি চরম কষ্ট স্বীকার করে, তাই কোন মুমিন আমাকে স্মরণ করলে ক্রন্দন না করে পারে না।'[৩৭]

সুতরাং, ইমাম হুসাইন (আ.)-এর জন্য ক্রন্দন ও আযাদারীর শিকড় প্রোথিত রয়েছে আমাদের দীন ও আকীদার অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন রেওয়ায়েত মোতাবেক এর অশেষ প্রভাব ও বরকত রয়েছে। তার মধ্যে উৎকৃষ্টতম প্রভাব হল তা আমাদের অন্তরসমূহের মরিচা বিদূরিত করে, আমাদের জীবনকে উন্নত করে এবং সত্যের পথে অকুতোভয় ও বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার দুর্নিবার মানসিকতা দান করে। ফলে আল্লাহ্‌র রহমত সকলের ওপরে অবারিত করে দেয়। শোকের এ শক্তি কত জালিমকে উৎখাত করেছে, কত মজলুমের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছে, ইসলামকে কতবার যে ধ্বংসের কবল থেকে উদ্ধার করেছে তা কেবল ইতিহাসই বলতে পারে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাই তো ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) তাঁর পিতার শাহাদাতের পর ইবনে যিয়াদের নিকট যেসব দাবি তুলে ধরেন তার অন্যতম ছিল, একজন বিশ্বাসভাজন লোককে কাফেলার সাথে পাঠাও যাতে পথিমধ্যে যেসব জায়গায় যাত্রা বিরতি করা হবে, সেখানে আযাদারী অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে দেয়। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় সেদিন দুশমন এ শর্তটি মেনেও নেয় এবং নোমান ইবনে বাশীরকে কাফেলার সাথে পাঠায়। কাফেলা যেখানেই যাত্রাবিরতি করছিল, নোমান সেখানেই তাঁদের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করে দিচ্ছিল যাতে ইমামপরিবার আযাদারীর অনুষ্ঠান করতে পারে। সেখানে ইমাম হুসাইনসহ কারবালার শহীদদের কঠিন বিপদ ও দুর্দশার কথা বর্ণনার মাধ্যমে একদিকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইমাম পরিবার সম্পর্কে সহানুভূতি সৃষ্টি, অপরদিকে জালেম ইয়াযীদ ও তার দোসরদের মুখোশ খুলে দিতে সক্ষম হন। স্বয়ং নোমান ইবনে বাশীর, যে নিজে ইমাম পরিবারকে মনেপ্রাণে ভালবাসত, দীর্ঘ এ যাত্রাপথে ইমাম যায়নুল আবেদীন ও হযরত যায়নাবের বয়ান শুনে এমনভাবে প্রভাবিত হয় যে, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে থাকে।

অতঃপর কাফেলা যখন মদীনায় পৌঁছে, তখন নোমান সবার আগে ছুটে গিয়ে মদীনায় প্রবেশ করে এবং প্রচণ্ডভাবে ক্রন্দন করতে করতে একটি কাসিদার মাধ্যমে আহলে বাইতের মুসিবতের কথা মদীনার জনগণের কাছে বর্ণনা করে। কাসিদাটির অংশবিশেষ নিম্নরূপ :

يا اهل يثرب لا مقام لكم قتل الحسين فارمعي مدرار
الجسم منه بكربلا مضرّج و الرأس منه على الدار يداراً

'হে মদীনাবাসী! তোমাদের জন্য আর কোন থাকার জায়গা রইল না। কারণ, হুসাইন কতল হয়েছেন। গায়ের জামাগুলো ছিঁড়ে ফেল, কেননা, তাঁর পবিত্র দেহ কারবালার ময়দানে টুকরো টুকরো হয়েছে। আর তাঁর কাটা মস্তক এখন বর্শার মাথায় নিয়ে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছে।'

মদীনার জনগণ এ খবর শুনে বেহাল ও বেকারার হয়ে পড়ে এবং নিজ নিজ ঘর ছেড়ে ছুটে বের হয়ে আসে। সবাই একাকার হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করতে থাকে এবং মদীনার আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে এমন এক হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয় যা মদীনা কোনদিন দেখেনি। সকলে পাগলপারা হয়ে নবী পরিবারের কাফেলার দিকে ছুটে যায়। এ খবর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়লো সর্বত্র। মুমিনের ঘরে ঘরে আযাদারী, শোক, মাতম এবং কান্নার রোল পড়ে গেল। একটি খিমা নির্মিত হল ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর জন্য। শোকার্ত মানুষ তাঁকে ঘিরে রেখেছিল, সান্ত্বনা প্রদান করছিল এবং তাঁর হাতে-পায়ে ভক্তিভরে চুম্বন করছিল। পুরুষরা উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করছিল ও ফরিয়াদ তুলছিল। আর নারীরা তাদের মুখ, বুক চাপড়াচ্ছিল। কাফেলা যখন শহরে প্রবেশ করে, তখন ইমাম হুসাইন (আ.)-এর ইয়াতিম বাচ্চাগুলোকে মদীনার নারীরা বুকে টেনে নিয়েছিল। আর পুরুষরা ইমাম যায়নুল আবেদীনকে সান্ত্বনা দিয়েছিল।

ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের পর বিখ্যাত সাহাবী হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ্ আল আনসারী কারবালা প্রান্তরে যান। সেখানে তাঁর বুকফাটা ক্রন্দন এবং সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত ইমাম হুসাইনের কবরপার্শ্বে তাঁর আকুলতার ভাষাগুলো যে কোন মুমিনের অন্তরে শোকের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। বৃদ্ধ বয়সে দৃষ্টিশক্তি হারানো এ মহান সাহাবী তাঁর বন্ধু ইমাম হুসাইনের কবরে আছড়ে পড়েন এবং তিনবার ইয়া হুসাইন বলে ডাক দেন। অতঃপর তিনি পরম ভক্তির সাথে হুসাইন (আ.)-এর স্মৃতিসমূহ স্মরণ করতে থাকেন। আর এ ঘটনার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ উচ্চারণ করতে থাকেন।

এভাবে আযাদারীর মজলিসের বিস্তার ঘটতে ঘটতে গোটা দুনিয়া জুড়ে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর স্মরণে শোক ও মাতম এক আদর্শে রূপ নেয়। ইসলামের রাহে শহীদ সম্রাট ইমাম হুসাইন (আ.) ও তাঁর একনিষ্ঠ সঙ্গীসাথীবৃন্দের শোকে মুহ্যমান মুমিনদের সে ঢল আজও অব্যাহত আছে, শত সহস্রগুণ বেশি ভক্তকুল সব বাঁধা অতিক্রম করে এ যিয়ারতের মিছিলে অংশগ্রহণ করে থাকে। এ শোক পালনের মধ্যে হক সবসময় সমহিমায় উদ্ভাসিত হওয়ার এবং বাতিল উৎপাটিত হওয়ার দরজা উন্মুক্ত হয়েছে। যার প্রভাবে ধর্মদ্রোহী উমাইয়্যারা ও ইয়াযীদরা ধর্মব্রতী সেজে আর ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি। পাশাপাশি হুসাইনী হয়ে বেঁচে থাকার প্রবল আকুতি নিয়ে অনুষ্ঠিত এসব আযাদারী অনুষ্ঠান এমন সব অসাধ্য সাধন করার অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে যে, স্বীকার করতে হবে, ইসলামের ইতিহাসে অনেক নজীরবিহীন বীরত্বগাথা মহাকাব্যের জন্ম হয়েছে এখান থেকেই। মুমীনদের আত্ম পরিচয় খুঁজে পাওয়ার এবং উন্নত মনোবৃত্তির সকল শিক্ষা নিহিত রাখা হয়েছে আশুরার শোক মাতমের মধ্যে। যতদিন এ মহান ইমামের মহান আত্মত্যাগের স্মরণে অন্তরে ভক্তি ও ভালবাসা থাকবে, আর জিহ্বায় থাকবে তার সাহসী প্রকাশ, ততদিন এ রক্তাক্ত শাহাদাতের বাণী সমুন্নত ও চিরন্তন থাকবে, পৌঁছে যাবে পরবর্তী বংশধরদের কাছে।

তথ্যসূত্র

১. যাখায়িরুল উকবা, পৃ. ১১৮

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২. তাহযিবুত তাহযিব, ইবনে হাজার, ২য় খণ্ড; মাজমাউল হায়সামি, ৯ম খণ্ড; কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড (এ মর্মে ভাবার্থ বর্ণিত হয়েছে)

৩. আল আদাব মিন সহীহ বুখারী; সহীহ তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬; মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ২য় খণ্ড; মুসনাদে আবি দাউদ, ৮ম খণ্ড

৪. কানযুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২১; সহীহ তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৬; মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ৩য় খণ্ড; হিলইয়াতু আবু নাঈম, ৫ম খণ্ড; তারিখে বাগদাদ, ৯ম খণ্ড; তাহযিবুত তাহযীব, ইবনে হাজার, ৩য় খণ্ড; সহীহ ইবনে মাজাহ; মুস্তাদরাকুস সাহীহাইন, ৩য় খণ্ড; হিলইয়াতুল আউলিয়া, আবু নাঈম, ৪র্থ খণ্ড

৫. সহীহ তিরমিযী, ২য় খণ্ড; ফায়যুল কাদীর, ১ম খণ্ড; মাজমাউল হায়সামি, ৯ম খণ্ড

৬. সহীহ তিরমিযী, ২য় খণ্ড; সহীহ ইবনে মাজাহ, ফাযায়েলে আসহাবুন নবী অধ্যায়; বুখারী ফি আদাবুল মুফরাদ

৭. আস সায়েরুল আউয়াল, আবদুল বাকি নাঈম আল আযহারী, মিশর থেকে মূদ্রিত।

৮. আস সায়েরুল আউয়াল গ্রন্থে তারিখে ইবনে আসাকির এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

৯. আল ইস্তিয়াব, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৪৪; আদাবুল মুফরাদ; বুখারী; আল ইসাবাহ্, ইবনে হাজার আসকালানী, ২য় খণ্ড; কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১০৪

১০. আস সায়েরুল আউয়াল, আবদুল বাকি নাঈম আল আযহারী, মিশর থেকে মূদ্রিত

১১. সহীহ বুখারী, বাদউল খাল্‌ক অধ্যায়; সহীহ তিরমিযী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০৭; মুসনাদে আহমাদ ইবনে হাম্বাল, ৩য় খণ্ড, পৃ ২৬১; কানযুল উম্মাল, ৭ম খণ্ড, পৃ. ১১০; মাজমাউ হায়সামি, ৯ম খণ্ড

১২. আত্-তামবিহ্ ওয়াল্ আশরাফ, পৃ. ২৮২–২৮৩; মাকতাবাতু খাইয়াত প্রকাশনী, বৈরুত, ১৯৬৫

১৩. তারীখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড

১৪. তুহাফুল উকুল, পৃ. ২৪১

১৫. মুরুজুয যাহাব, ৩য় খণ্ড

১৬. নাসেখুত তাওয়ারীখ, হযরত সাজ্জাদ (আ.)-এর জীবনী পর্ব, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪-২৬

১৭. প্রাগুক্ত, (এ অংশটুকু ইবনে আসীরের সূত্র থেকে বর্ণনা করা হয়েছে)

১৮. সুয়ূতী তাঁর তারীখুল খুলাফা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, মু'আবিয়া জোর খাটিয়ে ইয়াযীদের জন্য বাইয়াত আদায় করেন।

১৯. ফায্‌ল খারাযমী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৯

২০. মু'আবিয়া কর্তৃক ইয়াযীদকে যুবরাজ ঘোষণার কাহিনী ঐতিহাসিক মাসউদী তাঁর মুরুজুয যাহাব গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ২৭ পৃষ্ঠায় সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২১. উল্লেখ্য, আহনাফ ইবনে কায়েস ইরাকের অধিবাসী ছিলেন।
২২. George Jordac, Tragedy of Karbala.
২৩. নাসেখুত তাওয়ারীখ
২৪. প্রাগুক্ত
২৫. প্রাগুক্ত
২৬. তুহাফুল উকুল
২৭. নাসেখুত তাওয়ারিখ গ্রন্থের বর্ণনা থেকে সংক্ষিপ্ত ও উৎকলিত করা হয়েছে।
২৮. মুরুজুয যাহাব, মাসউদী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৭৩, বৈরুত থেকে মূদ্রিত।
২৯. সিয়াসাতুল হুসাইনিয়া, আল্লামা কাশেফুল গেতা
৩০. লুহুফ, সাইয়্যেদ ইবনে তাউস, পৃ. ১৩
৩১. নাসেখুত তাওয়ারীখ
৩২. তারীখে ইবনে আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮
৩৩. লুহুফ, সাইয়্যেদ ইবনে তাউস, পৃ. ৩৫; তাযকিরাহ, পৃ. ২৫০
৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮; কামেলুয যিয়ারাত, পৃ. ৭৫
৩৫. তারীখে ইবনে আসীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৮৮
৩৬. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ২৯৩
৩৭. কামেলুয যিয়ারাত, পৃ. ১০৯

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কতিপয় খুতবা, স্লোগান ও কথোপকথন

(মদীনা থেকে কারবালা পর্যন্ত)

মীনায় মদীনার আলেমদের সাথে বৈঠকে প্রদত্ত ভাষণ

আমীর মু'আবিয়ার জীবনের শেষ বছরে তথা কারবালার হৃদয়বিদারক ঘটনার এক বছর আগে হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) পবিত্র মক্কা নগরীর পার্শ্ববর্তী মীনায় মদীনার আলেম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাথে এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকে তিনি নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করেন :

'হে লোকসকল! আল্লাহ্ তা'আলা (বনি ইসরাইলের) আলেমদের যে তিরস্কার করেছেন ও উপদেশ দিয়েছেন তা থেকে তোমরা শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ কর। তিনি এরশাদ করেছেন :

لَوْلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ

"কেন (তাদের মধ্যকার) রাব্বানিগণ (আরেফ ও দরবেশগণ) ও আলেমগণ তাদের পাপ-কথা বলতে ও হারাম ভক্ষণ করতে নিষেধ করল না?"[১]

আল্লাহ্ আরও এরশাদ করেছেন :

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنۢ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُۥدَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا۟ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

"বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফ্‌রীতে লিপ্ত হয়েছিল তাদেরকে দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের কণ্ঠে অভিসম্পাত করা হয়। কারণ, তারা নাফরমানী করত ও (আল্লাহ্‌র নির্ধারিত) সীমা লঙ্ঘন করত। তারা যে সব মন্দ কাজ করত তা থেকে তারা পরস্পরকে নিষেধ করত না; তারা যা করত তা কতই না নিকৃষ্ট কর্ম!"[২]

কেন আল্লাহ্‌ তা'আলা তাদের এভাবে তিরস্কার করলেন? কারণ, তারা যালেমদের–পাপাচারীদের যুলুম ও পাপ কাজ করতে এবং ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করতে দেখত, কিন্তু তাদের কাছ থেকে পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভ ও যুলুমের হাত থেকে নিরাপদ থাকার উদ্দেশ্যে তাদের এ সব থেকে নিষেধ করত না। অথচ আল্লাহ্‌ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন :

...فَلَا تَخۡشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ...

"...তোমরা লোকদের ভয় কর না, কেবল আমাকেই ভয় কর...।"[৩]

তিনি আরও এরশাদ করেছেন :

وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ...

"আর মু'মিন পুরুষগণ ও নারিগণ পরস্পরের বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক; তারা (পরস্পরকে) ভাল কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখে...।"[৪]

আল্লাহ্‌ তা'আলা এ আয়াতে ভাল কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখাকে সর্বপ্রথম কর্তব্যকাজ (ফরয) হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কারণ, এ ফরয কাজটি আঞ্জাম দেওয়া হলে সহজ ও কঠিন নির্বিশেষে অন্য সমস্ত ফরয কাজই আঞ্জাম দেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। এছাড়া 'ভাল কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখা' মানে হচ্ছে ইসলামের প্রতি দাওয়াত প্রদান। কারণ, এর মানে হচ্ছে যুলুম-অত্যাচারের উচ্ছেদ সাধন, যালেম-অত্যাচারীদের প্রতি বিরোধিতা প্রদর্শন, বাইতুল মালের সম্পদ ও গনিমতের মাল (সকলের মাঝে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সমভাবে) বণ্টনের এবং যাদের ওপর কর প্রযোজ্য তাদের কাছ থেকে কর আদায় করা ও প্রকৃত হকদারদের মধ্যে তা বণ্টন করা।

হে শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ! কল্যাণ ও নেক আমলের জন্য খ্যাতিমান ব্যক্তিগণ! আর অন্যদের নসিহত করা ও উপদেশ দানের জন্য বিখ্যাত লোকেরা! জেনে রেখ, মানুষের অন্তরে তোমাদের জন্য যে ভক্তিশ্রদ্ধা ও মর্যাদা রয়েছে তা কেবল আল্লাহ্‌রই কারণে। তারা তোমাদের মধ্যকার শক্তিশালী লোকদের প্রতি আশার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে এবং তোমাদের মধ্যকার দুর্বল ও অক্ষমদের তারা সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে থাকে। তারা তাদের স্বজনদের তোমাদের জন্য উৎসর্গ করে, যদিও তাদের ওপরে তোমাদের কোনই শ্রেষ্ঠত্ব নেই। তাদের প্রয়োজন পূরণ না হলে তারা তোমাদের কাছে সুপারিশ চায়, আর তোমরা রাজা-বাদশাহ্‌দের ন্যায় শান-শওকতের সাথে এবং সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকদের ন্যায় মর্যাদা সহকারে পথ চলে থাক। এ সব কি কেবল এ কারণে সম্ভব হচ্ছে না যে, মানুষ তোমাদের ওপর এ মর্মে আশাবাদী যে, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত অধিকারসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য রুখে দাঁড়াবে? কিন্তু বেশির ভাগ বিষয়েই তোমরা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য প্রদর্শন করেছ এবং ইমামগণের অধিকারসমূহকে খুব হাল্কাভাবে নিয়েছ, আর দুর্বলদের অধিকারকে পয়মাল করেছ।

তোমরা যাকে নিজেদের অধিকার বলে মনে করেছ তা তোমরা অবৈধভাবে হস্তগত করেছ। অথচ তোমরা না আল্লাহ্‌র রাস্তায় তোমাদের ধনসম্পদ দান করেছ, না নিজেদের প্রাণ বিপদাপন্ন করেছ, আর না আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজ নিজ গোত্র ও স্বজনদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেছ।

বাহ্! এহেন ঘৃণ্য আমল সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'আলার বেহেশত লাভের ও নবী-রাসূলগণের প্রতিবেশী হবার এবং খোদায়ী আযাব হতে নিরাপদ থাকার আকাঙ্ক্ষা পোষণের মত কেমন ধৃষ্টতাই না তোমরা দেখাচ্ছ!

ওহে, আল্লাহ্‌র কাছে এ ধরনের প্রত্যাশা পোষণকারীরা! আমার ভয় হচ্ছে যে, তোমাদের ওপর হয়ত আল্লাহ্‌র পক্ষ থকে আযাব নাযিল হবে। কারণ, তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে এমন এক অবস্থানে উপনীত হয়েছ যে, অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হয়েছ। এমন কত লোকই না আছে যারা জনগণের মধ্যে সম্মানের পাত্র নয়, অথচ কেবল আল্লাহ্‌র জন্য তোমরা তাঁর বান্দাহ্‌দের মধ্যে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সম্মানজনক অবস্থানের অধিকারী। অথচ তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কৃত অঙ্গীকারসমূহ ভঙ্গ হতে দেখছ, কিন্তু এ ব্যাপারে টু-শব্দটিও করছ না এবং এ ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার ভয়ও সৃষ্টি হচ্ছে না। তোমাদের পূর্বপুরুষদের কতক অঙ্গীকার বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়ায় তোমরা বিলাপ করছ, অথচ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার ও চুক্তিসমূহকে উপেক্ষা করছ। শহরগুলোতে অনেক অন্ধ লোক আছে, অনেক বোবা লোক আছে, অনেক পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোক আছে, কিন্তু তোমরা না তাদের প্রতি কোন দয়া দেখাচ্ছ, না তোমাদের পক্ষে সম্ভব এমন কোন কাজ তাদের জন্য করছ, না এ ধরনের কাজ করার জন্য নিয়্যত পোষণ করছ; বরং তোমরা কেবল নিজেদের স্বার্থ ও আরাম-আয়েশের জন্য যালেম-অত্যাচারীদের তোষামোদ করছ।

আল্লাহ্ তা'আলা এ ধরনের নোংরা কাজ প্রতিহত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু তোমরা এ ব্যাপারে একেবারেই গাফেল– উদাসীন; তোমরা হচ্ছ সর্বাধিক ধ্বংসাত্মক লোক। কারণ, তোমরা জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও জেনে-শুনে তোমাদের দায়িত্ব পালন থেকে হাত গুটিয়ে রেখেছ। অথচ জনসাধারণের কাজকর্ম ও আইন-কানুন বাস্তবায়নের দায়িত্ব আলেমদের হাতে থাকা উচিত– যারা হবে আল্লাহ্ তা'আলার নির্ধারিত হালাল-হারাম কার্যকরকরণের ব্যাপারে আমানতদার।

কিন্তু এ দায়িত্ব ও এ মর্যাদা তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কারণ, তোমরা সত্যের অক্ষ থেকে দূরে সরে গিয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছ। অকাট্য দলীল-প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাতের ব্যাপারে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়েছ। দুঃখকষ্টের মোকাবিলায় তোমরা যদি ধৈর্যের পরিচয় দিতে এবং আল্লাহ্র দীনের পথে কষ্ট ও কাঠিন্য সহ্য করে নিতে তাহলে আল্লাহ্র দীনের বিষয়াদি কার্যকর করার দায়িত্ব তোমাদের হাতে এসে যেত। কিন্তু তোমরা যালেমদের নিজেদের জায়গায়– নিজেদের পদে ও মর্যাদায় বসিয়েছ এবং আল্লাহ্র দীনের বিষয়াদি তাদের হাতে সোপর্দ করেছ। আর তারা ভুলভাবে কাজ করে চলেছে এবং স্বীয় প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। তোমরা কি জান যে, কেন যালেমরা সকল বিষয়ের কর্তৃত্ব দখল করতে পেরেছে? কারণ, তোমরা মৃত্যুর হাত থেকে পলায়ন করেছ, তোমরা অপসৃয়মান পার্থিব যিন্দেগীর সাথে প্রেমিকসুলভ হৃদয় সহকারে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছ।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এরপর তোমরা দুর্বল ও অসহায় লোকদেরকে যালেমদের হাতে সোপর্দ করে দিয়েছ; এর ফলে তারা অনেককে তাদের দাস ও অধীনে পরিণত করেছে এবং অনেককে এক লোকমা খাদ্যের জন্য অসহায় ও অক্ষমে পরিণত করেছে। যালেমরা আল্লাহ্‌র রাজত্বে স্বেচ্ছাচারিতার সাথে যেমন খুশী পদক্ষেপ নিচ্ছে এবং তাদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় পথকে সহজ করে দিচ্ছে। তারা বদমাশ ও নীচ প্রকৃতির লোকদের অনুসরণ করছে এবং ধৃষ্টতার সাথে আল্লাহ্ তা'আলার বিরুদ্ধে দাঁড়াচ্ছে। তারা প্রতিটি শহরেই খুতবার মিম্বারে উঠে বক্তব্য পেশের জন্য বক্তা নিয়োগ করেছে এবং এ বক্তারা চিৎকার করে চলেছে ও উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছে। ধরণী পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে এবং সকল ক্ষেত্রেই তাদের হস্ত উন্মুক্ত ও প্রসারিত। জনগণ এমনভাবে তাদের দাসে পরিণত হয়েছে যে, তাদের মাথায় যে কেউ করাঘাত করুক না কেন, তারা নিজেদের প্রতিরক্ষা করতে সক্ষম নয়।

এই হিংসুক ও ঈর্ষাকারী উদ্ধত যালেমদের একটি গোষ্ঠী অসহায়দের ওপর অত্যন্ত কঠিনভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তাদের একটি গোষ্ঠী হচ্ছে এমন ধরনের শাসক যে, না তারা আল্লাহ্‌কে মানে, না তারা শেষ বিচারের দিনের ওপর ঈমান রাখে। আশ্চর্য!

কেনই বা বিস্মিত হব না? একজন ধোঁকাবাজ ও প্রতারক ব্যক্তি–পরকাল যার অন্ধকার–হুকুমত দখল করেছে; মু'মিনদের দায়িত্বের বোঝা এমন এক ব্যক্তি কাঁধে তুলে নিয়েছে যে কখনই তাদের প্রতি দয়া দেখায় না।

আমাদের ও তার মাঝে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে সে ব্যাপারে আল্লাহ্ তা'আলাই সর্বোত্তম ফয়সালাকারী; তিনিই তার সাথে আমাদের লড়াইয়ের ফয়সালা করে দেবেন।

হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের কাজকর্ম সম্বন্ধে অবগত; তুমি জান যে, আমরা যা বলছি তা না কর্তৃত্ব ও শাসনক্ষমতা হস্তগত করার জন্য, না কারও প্রতি শত্রুতা ও ঈর্ষা চরিতার্থ করার জন্য; বরং (আমাদের সংগ্রাম এজন্য যে,) যাতে তোমার পতাকাকে উড্ডীন করতে পারি, তোমার বান্দাহ্‌দের ভূখণ্ডকে আবাদ করতে পারি, যালেম ও নিপীড়কদের হাত থেকে তোমার বান্দাহ্‌দের নিরাপদ করতে পারি, আর (সমাজের বুকে) তোমার আহকাম, সুন্নাত ও ফরযগুলোকে বাস্তবায়ন করতে পারি। তুমি যদি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমাদের সাহায্য না কর তাহলে যালেম ও নিপীড়ক গোষ্ঠী বিজয়ী হবে এবং তোমার নবী-রাসূলগণের নূরকে নির্বাপিত করে ফেলবে।

আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং আমরা তাঁরই ওপর ভরসা করি, আর তাঁর পথেই আমরা চলব এবং তাঁর দিকেই আমাদের প্রত্যাবর্তন।[৫]

আমীর মু'আবিয়ার মৃত্যু ও ইয়াযীদের বাই'আত্ দাবি

৬০ হিজরির রজব মাসে মু'আবিয়া বিন্ আবু সুফিয়ানের মৃত্যুর পর ইয়াযীদ (তার ওপর আল্লাহ্র লা'নত) দামেশ্কের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়। সে ক্ষমতায় বসেই মদীনার প্রশাসক ওয়ালীদকে এক পত্র মারফত মদীনাবাসীর, বিশেষ করে হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কাছ থেকে বাই'আত্ আদায়ের জন্য নির্দেশ দেয়। ইয়াযীদ তার পত্রে মদীনার প্রশাসককে এ মর্মে আদেশ দেয় যে, হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) ইয়াযীদের অনুকূলে বাই'আত্ হতে অস্বীকৃতি জানালে যেন তাঁকে হত্যা করা হয় এবং তাঁর মাথা দামেশ্কে ইয়াযীদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ইয়াযীদের নিকট থেকে পত্র পাওয়ার পর ওয়ালীদ বনি উমাইয়্যার বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি মারওয়ান বিন্ হাকামকে ডেকে পাঠায় এবং হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর ব্যাপারে করণীয় সম্বন্ধে তার সাথে পরামর্শ করে। মারওয়ান বলে : 'সে বাই'আত্ হতে রাযী হবে না; তোমার জায়গায় আমি হলে তার শিরশ্ছেদ করতাম।'

ওয়ালীদ বলল : 'হায়! আমার যদি আদৌ জন্ম না হত!' এরপর সে হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-কে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠায়।

ইমাম হুসাইন (আ.) বনি হাশিমের ত্রিশ জন লোক ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের সাথে নিয়ে ওয়ালীদের কাছে এলেন। ওয়ালীদ তাঁকে আমীর মু'আবিয়ার মৃত্যুর সংবাদ জানাল এবং তাঁকে ইয়াযীদের অনুকূলে বাই'আত্ হওয়ার জন্য বলল।

ইমাম হুসাইন (আ.) জবাব দিলেন : 'হে আমীর (প্রশাসক)! বাই'আত্ তো আর গোপনে হয় না। তুমি যখন জনসাধারণকে বাই'আতের জন্য ডাকবে তখন তাদের সাথে আমাকেও ডেক।'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তখন মারওয়ান ওয়ালীদকে বলল : 'হে আমীর! তার এ ওযর গ্রহণ কর না; বাই'আত্ না হলে তার শিরশ্ছেদ কর ।'

এ কথায় হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) ক্রুদ্ধ হলেন । তিনি বললেন : 'ওহে বদকার নারীর পুত্র! তুই ধ্বংস হ । তুই বলছিস্ যে, আমার শিরশ্ছেদ করবে? মিথ্যা বলেছিস এবং লাঞ্ছিত হয়েছিস ।'

এরপর তিনি ওয়ালীদের দিকে ফিরে বললেন : 'হে আমীর! আমরা নবুওয়াতের আহ্লে বাইত এবং রিসালাতের খনি যাদের কাছে ফেরেশতারা আসা-যাওয়া করে । আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টিলোকের অস্তিত্বদান আমাদের মাধ্যমে শুরু করেছেন এবং আমাদের মাধ্যমেই একে সমাপ্তিতে পৌঁছাবেন । অন্যদিকে ইয়াযীদ হচ্ছে এক ফাসেক লোক; সে মদ্যপায়ী এবং সম্মানিত লোকদের হত্যাকারী । সে প্রকাশ্যেই পাপ কাজ করে থাকে । সে এ পদের (খেলাফতের) জন্য উপযুক্ত নয় । আমার মত ব্যক্তি এ ধরনের কোন লোকের অনুকূলে বাই'আত্ হতে পারে না । তবে আমি আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব যাতে এ ব্যাপারে তুমিও চিন্তা করে দেখতে পার এবং আমরা সকলেও চিন্তা করে দেখতে পারি যে, আমাদের মধ্য থেকে কোন্ ব্যক্তি খেলাফতে অধিষ্ঠিত হওয়ার ও বাই'আত্ লাভের জন্য অধিকতর উপযুক্ত ।'

এ সময় মারওয়ান ওয়ালীদকে বলল : 'তুমি আমার কথার বিরোধিতা করলে ।'

ওয়ালীদ বললো : 'আফসোস্ তোমার জন্য, হে মারওয়ান! তুমি আমাকে আমার দীন ও দুনিয়া উভয়টিই ধ্বংস করতে বলছ । আল্লাহ্র শপথ, আমি সারা দুনিয়ার ধনসম্পদের মালিক হওয়ার বিনিময়েও হুসাইনের হত্যাকারী হতে চাই না । আল্লাহ্র শপথ, আমার মনে হয় না যে, এমন একজন লোকও পাওয়া যাবে যে ব্যক্তি হুসাইনের রক্তে তার হাত রঞ্জিত অবস্থায় আল্লাহ্র সাথে সাক্ষাৎ করতে প্রস্তুত হবে, যদি না তার আমলের পরিমাণ এতই হাল্কা হয় যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তার প্রতি রহমতের দৃষ্টিপাত করবেন না ও তাকে পবিত্র করবেন না; বরং তার জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অপেক্ষা করতে থাকবে ।'

বর্ণনাকারী বলেন : 'ঐ রাত পার হয়ে গেলে হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) খবর জানার জন্য প্রত্যুষে তাঁর ঘর থেকে বের হলেন । পথে মারওয়ানের সাথে তাঁর দেখা হল ।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মারওয়ান ইমাম হুসাইনকে বলল : 'হে আবা আবদিল্লাহ্! আমি তোমার খবর জানতে চাই; তুমি আমার কথা শোন যাতে সঠিক পথ পেতে পার।'

ইমাম হুসাইন বললেন : 'আগে শুনি তুমি কী বলতে চাও।'

মারওয়ান বলল : 'আমার প্রস্তাব হচ্ছে এই যে, তুমি যদি আমীরুল মু'মিনীন ইয়াযীদের অনুকূলে বাই'আত্ হও তাহলে তা তোমার দীন ও দুনিয়া উভয়ের জন্যই মঙ্গলজনক।'

জবাবে ইমাম হুসাইন বললেন : 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন্। উম্মাহ্ যখন ইয়াযীদের ন্যায় শাসকের কবলে পড়ে তখন ইসলামকে বিদায়! আর আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে শুনেছি, তিনি এরশাদ করেছেন : আবু সুফিয়ানের পরিবারের জন্য খেলাফত হারাম।'

হযরত ইমাম হুসাইন ও মারওয়ানের মধ্যকার কথোপকথন অনেকক্ষণ যাবৎ চলল। শেষ পর্যন্ত মারওয়ান ক্রুদ্ধ ও ক্ষিপ্ত হয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

মক্কাত্যাগকালীন ভাষণ

হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) পবিত্র মদীনা মুনাওয়ারায় রক্তপাত এড়ানোর লক্ষ্যে পরিবার-পরিজন ও ভক্ত-অনুরক্তদের নিয়ে মদীনা ছেড়ে পবিত্র মক্কা নগরীতে চলে যান এবং মসজিদে হারামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে থাকাকালে তাঁকে কুফায় গিয়ে বিপ্লবে নেতৃত্বদানের জন্য কুফাবাসীর পক্ষ থেকে দাওয়াত আসতে থাকে। ইতিমধ্যে যখন তিনি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পারলেন যে, ইয়াযীদ হজ্বের সময় লোকজনের ভীড়ের মধ্যে তাঁকে হত্যা করার জন্য গুপ্তঘাতক পাঠিয়েছে, তখন পবিত্র স্থানে রক্তপাত এড়ানোর লক্ষ্যে তিনি হজ্বের আগের দিন আটই যিলহজ্ব প্রত্যুষে কুফার উদ্দেশে মক্কা ত্যাগ করেন। এর আগের রাতে তিনি তাঁর কাছে সমবেত তাঁর কতক বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সদস্য, সঙ্গীসাথী, অনুসারী ও উপস্থিত জনতার উদ্দেশে নিম্নোক্ত ভাষণ প্রদান করেন :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

'সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি যা চাইবেন তা-ই হবে। তাঁর সম্মতি ছাড়া কারও পক্ষেই কোন কাজ সম্পাদন করা সম্ভব নয়। প্রশংসা আল্লাহ্‌র এবং তাঁর রাসূলের ওপর দরূদ বর্ষিত হোক।

আদম-সন্তানদের গলায় মৃত্যুর দাগ কেটে দেওয়া হয়েছে (অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে) যেভাবে যুবতীদের গলায় হারের দাগ কেটে থাকে। ইয়াকুব (আ.) যেভাবে ইউসুফ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন ঠিক সেভাবেই আমি আমার পূর্ববর্তী পুণ্যবানদের সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করি। আর যে জায়গা আমার শাহাদাত্‌গাহ্ হবে এবং আমার লাশ গ্রহণ করবে সে জায়গা আমার জন্য পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাকে এখন সেখানে পৌঁছতে হবে। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, কারবালার নাওয়াভীসে[৬] মরুভূমির নেকড়েরা আমার শরীর ছিন্নভিন্ন করছে এবং তাদের শূন্য উদর ভর্তি করছে। আর কোন মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা থেকে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আল্লাহ্ তা'আলা যাতে সন্তুষ্ট, আমরা রিসালাতের পরিবারও তাতেই সন্তুষ্ট। এ হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে পরীক্ষা; আমি এ পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করব। আর ধৈর্যশীলদের প্রতিদান পরম দাতা আল্লাহ্ তা'আলার হাতে। যারা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সাথে আত্মীয়তা ও ঘনিষ্ঠতার সম্পর্ক রাখে তারা তাঁর থেকে পৃথক হবে না এবং বেহেশ্‌তে তাঁর সমীপে থাকবে, আর তাদের দর্শনে আল্লাহ্ তা'আলার মহান রাসূলের নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হবে।

আমি প্রত্যুষে রওনা হব, ইনশা আল্লাহ্।[৭]

আশুরার রাতের ভাষণ

হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) আশুরার রাতে অর্থাৎ ৬১ হিজরির নয়ই মুহররম দিবাগত রাতে কারবালা প্রান্তরে তাঁর সঙ্গীসাথীদের এক জায়গায় সমবেত করেন এবং তাঁদের উদ্দেশে নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন :

'সর্বোত্তম প্রশংসা সহকারে আল্লাহ্ তা'আলার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আনন্দ ও দুঃখ-কষ্ট উভয় অবস্থায়ই তাঁর প্রশংসা করছি। হে আমার রব! যেহেতু তুমি আমাদের নবুওয়াতের দ্বারা সম্মানিত করেছ, কুরআন ও দীনের জ্ঞান দ্বারা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

মর্যাদামণ্ডিত করেছ এবং আমাকে শোনার মত কান, দেখার মত চোখ ও সচেতন অন্তঃকরণ প্রদান করেছ সে জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। হে আল্লাহ্! আমাকে তোমার প্রশংসাকারীদের অন্তর্ভুক্ত করে নাও।

আমার সঙ্গীসাথীদের তুলনায় আন্তরিক ও একনিষ্ঠ সঙ্গীসাথী (আর কারও) ছিল বা আছে বলে আমার জানা নেই। আর আমার আহ্‌লে বাইতের (পরিবারের) তুলনায় অধিকতর অনুগত আহ্‌লে বাইতের কথাও আমার জানা নেই। তেমনি আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজখবর নেওয়ার ক্ষেত্রেও আমার আহ্‌লে বাইতের তুলনায় নিষ্ঠাবান আহ্‌লে বাইত আছে বলে জানি না। আমাকে সাহায্য-সহায়তা করার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন।

আমি জানি যে, আগামীকাল তাদের (ইয়াযীদী পক্ষের) সাথে আমাদের ব্যাপারটা যুদ্ধে পর্যবসিত হবে। তাই আমি আমার অনুকূলে তোমাদের কৃত বাই'আত্ তুলে নিচ্ছি। আমি তোমাদের অনুমতি দিচ্ছি, তোমরা পথ চলার জন্য ও এখান থেকে দূরে চলে যাওয়ার জন্য রাতের অন্ধকারকে ব্যবহার কর এবং বিভিন্ন গ্রাম ও শহরে বিক্ষিপ্ত হয়ে যাও যাতে আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের জন্য বেরিয়ে যাওয়ার পথ বের করে দেন এবং তোমরা মুক্তি লাভ করতে পার। ঐ লোকগুলো আমাকে চায়। অতএব, তারা আমাকে পেলে তোমাদের সাথে তাদের কোন কাজ নেই।'[৮]

হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) তাঁর সঙ্গীসাথীদের ওপর থেকে বাই'আতের দায় তুলে নেওয়া সত্ত্বেও তাঁদের মধ্য থেকে কেউই তাঁকে ত্যাগ করে চলে যাননি।

আশুরার দিনে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর প্রথম ভাষণ

আশুরার দিন সকালে হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) তাঁর ঘোড়া আনতে বললেন এবং তা আনা হলে তিনি তার ওপর আরোহণ করলেন। এরপর তিনি ইয়াযীদের অনুগত সেনাপতি ওমর বিন্ সা'দের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর দিকে মুখ করে উচ্চৈঃস্বরে এমনভাবে আহ্বান করে তাঁর ভাষণ শুরু করলেন যে, তাদের মধ্যকার অধিকাংশ লোকই তা শুনতে পেল। ইমাম বলতে লাগলেন : 'হে লোকসকল! আমার কথা শোন এবং (আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) তাড়াহুড়া কর না যতক্ষণ না আমি তোমাদের সেই বিষয়ে উপদেশ প্রদান করি যে ব্যাপারে আমার ওপর তোমাদের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অধিকার আছে এবং যতক্ষণ না আমার পক্ষ থেকে প্রকৃত বিষয় তোমাদের কাছে পেশ করি। অতঃপর তোমরা যদি আমার ওযর কবুল কর, আর আমার কথার সত্যতা স্বীকার কর এবং আমার প্রতি তোমাদের পক্ষ থেকে ইনসাফ কর তাহলে এ কারণে তোমরা অধিকতর সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। সে ক্ষেত্রে আমার ব্যাপারে তোমাদের আর কোন দায়িত্ব থাকবে না। আর তোমরা যদি আমার ওযর কবুল না কর এবং তোমাদের পক্ষ থেকে ইনসাফের পরিচয় না দাও তাহলে (আমি হযরত নূহের ভাষায় বলব :)

... فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونِ

"...অতঃপর তোমরা তোমাদের ও তোমাদের শরীকদের কাজকর্ম গোছগাছ করে নাও যাতে তোমাদের কাজ তোমাদের কাছে অস্পষ্ট না থাকে, অতঃপর আমার ব্যাপারে তোমাদের সিদ্ধান্ত কার্যকর কর এবং আর অপেক্ষা কর না।"[৯]

إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْكِتَـٰبَ ۖ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّـٰلِحِينَ

"নিঃসন্দেহে আমার অভিভাবক হচ্ছেন আল্লাহ্, যিনি কিতাব (কুরআন) নাযিল করেছেন এবং তিনি পুণ্যবানদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ করবেন।"[১০]

এরপর হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) প্রতিপক্ষের কয়েক জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম ধরে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করে বললেন : 'হে শাবাছ্ বিন্ রাব্'ঈ! হে হাজ্জার্ বিন্ আব্জার্! হে কায়স্ বিন্ আশ্'আছ! হে ইয়াযীদ বিন্ হারেছ্! তোমরা কি আমাকে এ বলে পত্র লিখনি যে, 'ফল পেকে গেছে এবং যমিন সবুজে ঢেকে গেছে; আপনি যদি আসেন, তাহলে আপনার খেদমতে একটি সুসজ্জিত বাহিনী দেখতে পাবেন?'

তখন কায়স্ বিন্ আশ্'আছ জবাব দিল : 'আমরা বুঝতে পারছি না আপনি কী বলছেন। তবে আপনি যদি আপনার চাচার গোত্রের[১১] ফরমানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তাহলে কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছু দেখবেন না।'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর খিমার (তাঁবুর) নারী ও কন্যারা যখন তাঁর ভাষণ শুনতে পেলেন তখন তাঁরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। হযরত ইমাম (আ.) তাঁদেরকে থামতে বলার জন্য তাঁর ভাই আব্বাস ও স্বীয় পুত্র আলী আকবারকে নারীদের তাঁবুতে পাঠালেন। তিনি বলে পাঠালেন : 'আমার প্রাণের শপথ, এরপরে তোমরা আমার জন্য অনেক বেশি ক্রন্দন করবে।'

মহিলারা ও বালিকারা নীরব হলে হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করলেন। অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় আল্লাহ্ তা'আলাকে স্মরণ করলেন এবং হযরত রাসূলে আকরাম (সা.), পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ ও ফেরেশতাগণের প্রতি দরূদ পাঠালেন। এরপর তিনি তাঁর ভাষণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখলেন :

'তোমরা আমার নসবের (বংশ পরম্পরার) বিষয়টি স্মরণ কর, ভেবে দেখ, আমি কে। তোমাদের হুঁশ হোক; তোমরা নিজেদের ধিক্কার দাও এবং ভেবে দেখ যে, আমাকে হত্যা করা এবং আমার মর্যাদা বিনষ্ট করা কি তোমাদের জন্য জায়েয?'

'আমি কি তোমাদের রাসূলের কন্যার পুত্র নই? আমি কি তাঁর (রাসূলের) স্থলাভিষিক্ত ও চাচাত ভাইয়ের পুত্র নই– যিনি সকলের আগে ঈমান এনেছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ্ (সা.) যা এনেছিলেন তার সত্যতা স্বীকার করেছিলেন?' 'সাইয়্যেদুশ্ শুহাদা হামযাহ্ কি আমার চাচা[১২] নন?' 'জা'ফর তাইয়ার– আল্লাহ্ তা'আলা যাঁকে কারামতস্বরূপ দু'টি পাখা দিয়েছেন যাতে তিনি তা দিয়ে বেহেশ্তের ভিতরে উড়তে পারেন, তিনি কি আমার চাচা নন?' 'তোমরা কি জান না যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা.) আমার ও আমার ভাই সম্পর্কে এরশাদ করেছেন : 'এ দু'জন হচ্ছে বেহেশ্তে যুবকদের নেতা।'?'

'তোমরা যদি আমার কথায় বিশ্বাস করতে না পার এবং আমার কথার সত্যতায় সন্দেহ পোষণ করে থাক, তাহলে আল্লাহ্ তা'আলার শপথ করে বলছি, যখন থেকে জেনেছি যে, আল্লাহ্ তা'আলা মিথ্যাবাদীকে তাঁর দুশমন হিসাবে গণ্য করেন তখন থেকে কখনই মিথ্যা কথা বলিনি। তোমাদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা তাদের সত্যবাদিতার জন্য সুপরিচিত, তারা আমার কথার সত্যতা স্বীকার করবে। তোমরা জাবের বিন্ আবদুল্লাহ্ আনসারী, আবু সা'ঈদ খুদরী, সাহ্ল্ বিন্ সা'দ্, যায়দ্ বিন্ আর্ক্বাম্ ও আনাস্ বিন্ মালেকের কাছে জিজ্ঞাসা কর যাতে তারা আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছ থেকে যা শুনেছেন তা তোমাদের কাছে বর্ণনা করেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাহলে তোমাদের কাছে আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। এসব সাক্ষ্য কি আমার রক্তপাত ঘটানো থেকে তোমাদের বিরত থাকার জন্য যথেষ্ট নয়?'[১৩]

ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সাথে শিম্‌রের কথোপকথন

এ সময় ইয়াযীদের সেনাদলের অন্যতম সেনাপতি শিম্‌র্ বিন্ যিল্ জাওশান্ বলল : 'তুমি যা বললে তা-ই যদি হয়ে থাকে, তাহলে আমি কখনই মজবুত 'আক্বীদাহ্ সহকারে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করিনি।'

তখন ইমামের অন্যতম সঙ্গী হাবীব বিন্ মাযাহের বললেন : 'আল্লাহ্‌র শপথ, আমি দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি নড়বড়ে 'আক্বীদাহ্ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সহকারে আল্লাহ্‌র ইবাদাত করছ। আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি এখন সত্য বলছ; আসলে তুমি বুঝতে পারছ না যে, ইমাম কী বলছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তোমার অন্তঃকরণের ওপর গাফলাতের মোহর মেরে দিয়েছেন।'

ইমাম হুসাইন শিম্‌র্‌কে বললেন : 'তোমার কি এ ব্যাপারেও কোন সন্দেহ আছে যে, আমি রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যার সন্তান? আল্লাহ্‌র শপথ, এ বিশ্বে পূর্ব ও পশ্চিমের দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কন্যার পুত্র আমি ছাড়া আর কেউ নয়। তোমার জন্য পরিতাপ! আমি কি তোমার কাউকে হত্যা করেছি যে, আমার কাছ থেকে তার রক্তের বদলা আদায় করতে চাচ্ছ? আমি কি তোমার কোন সম্পদ বিনষ্ট করেছি, নাকি আমার কাঁধে কারও কেসাসের দায় রয়েছে যা তুমি কার্যকর করতে চাচ্ছ?'

এ সময় ইয়াযীদী পক্ষের লোকেরা চুপ করে থাকল। কারণ, তখন তাদের বলার মত কোন কথাই ছিল না। এরপর ইমাম হুসাইন পুনরায় ইয়াযীদের দলের কয়েক জন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম ধরে উচ্চৈঃস্বরে সম্বোধন করে বললেন : 'হে শাবাছ্ বিন্ রাব্'ঈ! হে হাজ্জার্ বিন্ আব্‌জার্! হে কায়স্ বিন্ আশ্'আছ! হে ইয়াযীদ বিন্ হারেছ্! তোমরা কি আমাকে এ বলে পত্র লিখনি যে, 'ফল পেকে গেছে এবং যমিন সবুজে ঢেকে গেছে; আপনি যদি আসেন তাহলে আপনার খেদমতে একটি সুসজ্জিত বাহিনী দেখতে পাবেন।'?'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইমাম হুসাইন (আ.) এরপর ইয়াযীদী বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে নিজের সম্বন্ধে বলতে লাগলেন :

'হে কুফাবাসী! তোমাদের মায়েরা তোমাদের শোকে ক্রন্দন করুক। তোমরা আল্লাহ্ তা'আলার এ নেক বান্দাহ্কে দাওয়াত করেছিলে এবং বলেছিলে : আমরা আপনার পথে জীবন বিলিয়ে দেব। কিন্তু এখন তোমরা তার বিরুদ্ধে তোমাদের তলোয়ারগুলোকে উন্মুক্ত করেছ এবং তাকে সকল দিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলেছ। তোমরা তাকে এ বিশাল পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা চলে যাবার জন্য সুযোগ দিচ্ছ না। এখন সে বন্দীর মত তোমাদের হাতে আটকা পড়ে আছে। তোমরা তাকে এবং তার পরিবারের নারী ও কন্যাদের ফোরাতের পানি পান করতে বাধা দিয়েছ, অথচ ইহুদী ও খ্রিস্টান গোত্রসমূহের লোকেরাও সেখান থেকে পানি পান করছে। এমনকি পিপাসায় আমাদের পশুগুলোর প্রাণও ওষ্ঠাগত হয়েছে এবং সেগুলো ছটফট করছে ও গড়াগড়ি দিচ্ছে। তোমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বংশধরদের ব্যাপারে তাঁর বর্ণিত মর্যাদার সীমারেখাকেও রক্ষা করনি। মহাপিপাসার দিনে আল্লাহ্ তোমাদের পরিতৃপ্ত না করুন।'

তখন কায়স্ বিন্ আশ্'আছ পুনরায় জবাব দিল : 'আমরা বুঝতে পারছি না, আপনি কী বলছেন। তবে আপনি যদি আপনার চাচার গোত্রের ফরমানের কাছে আত্মসমর্পণ করেন তাহলে কল্যাণ ব্যতীত অন্য কিছু দেখবেন না।'

জবাবে হযরত ইমাম হুসাইন বললেন : 'আল্লাহ্র শপথ, আমি তোমাদের দিকে হীন-লাঞ্ছিতের হাত বাড়িয়ে দেব না এবং (তোমাদের সামনে থেকে) ক্রীতদাসের ন্যায় পালিয়েও যাব না।"[১৪]

এরপর ইমাম বললেন : 'হে আল্লাহ্র বান্দাহ্গণ! আমি তাঁর কাছে আশ্রয় চাচ্ছি যিনি আমার রব এবং তোমাদেরও রব। কিন্তু যে সব উদ্ধত লোক কিয়ামত দিবসের ওপর ঈমান রাখে না তাদের ওপর আমি অসন্তুষ্ট। আর তাদের হিংস্রতা থেকে আমি তাঁরই কাছে আশ্রয় চাচ্ছি।'

এরপর ইমাম তাঁর বাহন ঘোড়াটিকে শোয়ালেন এবং সেটির পা বাঁধার জন্য উক্ববাহ্ বিন্ সিম্'আন্কে নির্দেশ দিলেন।[১৫]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আশুরার দিনে ইমাম হুসাইন (আ.)-এর দ্বিতীয় ভাষণ

দুশমন বাহিনী নীরব হলে হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) তাদেরকে সম্বোধন করে পুনরায় বলতে লাগলেন :

'হে লোকসকল! ধ্বংস ও দুঃখ তোমাদের ঘিরে ফেলুক; কারণ, (মনে করে দেখ,) কেমন বর্ণনাতীত আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস সহকারে তোমরা আমাকে দাওয়াত করেছিলে! আর এ কারণেই আমি এখানে এসেছি। আমি খুব দ্রুত তোমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে এসেছি। কিন্তু আমরা তোমাদের হাতে যে তলোয়ার অর্পণ করেছিলাম[১৬] তা-ই আমাদের বিরুদ্ধে কোষমুক্ত করেছ। আর আমরা আমাদের দুশমন ও তোমাদের দুশমনদের বিরুদ্ধে যে অগ্নি প্রজ্বলিত করেছিলাম তোমরা তাকেই আমাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডতর করে তুলেছ। তোমরা তোমাদের বন্ধুদের বিরুদ্ধে ও দুশমনদের সপক্ষে যুদ্ধের জন্য দাঁড়িয়ে গিয়েছ, যদিও তারা না তোমাদের সাথে ইনসাফ ও সুবিচারের সাথে আচরণ করেছে, না তাদের দ্বারা তোমাদের কোন কল্যাণ হবে বলে আশা করা যায়, আর না আমরা এমন কোন কাজ করেছি যে কারণে আমাদের বিরুদ্ধে এ ধরনের শত্রুতা ও আগ্রাসনের সঙ্গত কারণ থাকতে পারে।

পরিতাপ তোমাদের জন্য; তোমাদের তলোয়ারগুলো যখন খাপে বদ্ধ ছিল, আর তোমাদের হৃদয়গুলো শান্ত ছিল এবং তোমাদের চিন্তাশক্তি সুশৃঙ্খল ছিল তখন কেন তোমরা আমাদের পরিত্যাগ করনি? তোমরা মাছির মত ফিত্‌নার দিকে উড়ে গিয়েছ, প্রজাপতিদের (আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার) মত একজন আরেক জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছ। হে ক্রীতদাসীর দাসগণ! হে আহ্‌যাবের[১৭] অবশিষ্ট লোকেরা! হে কিতাব (কুরআন) পরিত্যাগকারীরা! হে আল্লাহ্‌র কালাম বিকৃতকারীরা[১৮]! হে রাসূলের সুন্নাতকে বিস্মৃতির অতলে নিক্ষেপকারীরা! হে নবী-রাসূলগণের বংশধরদের ও তাঁদের অছিদের (মনোনীত প্রতিনিধিদের) বংশধরদের হত্যাকারীরা[১৯]! হে জন্মপরিচয়হীনদের জন্মপরিচয়ের অধিকারীদের সাথে সংযুক্তকারীরা[২০]! হে মু'মিনদের কষ্ট প্রদানকারীরা! হে 'কুরআনকে ছিন্ন করে ফেলল' বলে চিৎকারকারীদের নেতারা[২১]! তোমরা ধ্বংস হও।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমি বলছি, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং আমাকে হত্যা কর না। কারণ, আমাকে হত্যা করা বা অবমাননা করা তোমাদের জন্য জায়েয নয়। আমি তোমাদের রাসূলের কন্যার সন্তান, আর আমার নানী খাদীজাহ্‌ তোমাদের রাসূলের স্ত্রী। হয়ত রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর সেই কথা তোমাদের কাছে পৌঁছে থাকবে যে, তিনি এরশাদ করেছেন : 'হাসান ও হুসাইন হচ্ছে বেহেশতবাসী যুবকদের দুই নেতা।'

হ্যাঁ, আল্লাহ্‌র শপথ, ওয়াদা ভঙ্গ করা, বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ করা তোমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। তোমাদের (তোমরা হচ্ছ এমন বৃক্ষতুল্য যার) মূল ধোঁকা, প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার সাথে মিশে গেছে। তোমাদের শাখা-প্রশাখাসমূহ এর ওপর ভিত্তি করেই প্রসারিত হয়েছে। তোমরা হচ্ছ সর্বাধিক নোংরা– নিকৃষ্টতম ফল; তাই তোমরা স্বীয় বাগান-মালিকের গলায় আটকে যাও এবং আত্মসাৎকারী ও লুণ্ঠনকারীদের জন্য সুস্বাদু ও সুখাদ্য হয়ে যাও।

আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে লা'নত বর্ষিত হোক সেই অঙ্গীকার ভঙ্গকারীদের ওপর যারা মজবুত করে অঙ্গীকারাবদ্ধ হবার পরও তা ভঙ্গ করেছে। তোমরা (তোমাদের অঙ্গীকারের ব্যাপারে) আল্লাহ্‌কে সাক্ষী করেছিলে এবং তাঁর নামে শপথ করেছিলে; তোমরা হচ্ছ সেই অঙ্গীকার ভঙ্গকারী গোষ্ঠী। এখন পিতৃপরিচয়হীনের পুত্র পিতৃপরিচয়হীন[২২] আমাকে দু'টি বিষয়ের মধ্যে একটি বেছে নিতে বলেছে : হয় যুদ্ধ নয়ত লাঞ্ছিত জীবন। দূর হোক লাঞ্ছনা আমা থেকে; আমি কখনই লাঞ্ছনা মেনে নেব না। আল্লাহ্‌, রাসূল (সা.) ও মু'মিনগণ কখনই আমাদের জন্য কাপুরুষতা পছন্দ করেননি। যে সব পবিত্র কোল আমাদের লালন-পালন করেছেন তাঁরা এবং আত্মমর্যাদাবান লোকেরা কখনই হীন ও নীচদের আনুগত্যকে নিহত হওয়ার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করবেন না। আমি এ স্বল্পসংখ্যক লোক নিয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব, এমনকি আমার সঙ্গীসাথীরা যদি আমাকে একা ফেলে যায় তবুও।[২৩]

এরপর হযরত হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) একটি কবিতা আবৃত্তি করেন যার অর্থ নিম্নরূপ :

"যদি আমি বিজয়ী হই তো আমি অনেক আগে থেকেই বিজয়ী হয়ে আছি, আর আমি যদি পরাজিত হই, তবুও আমি পরাজিত নই। আমরা ভয়ে অভ্যস্ত নই; বরং আমাদের নিহত হওয়া অন্যদের ধনসম্পদের অধিকারী হওয়ার প্রায় সমার্থক।"

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এরপর তিনি তাঁর ভাষণের ধারাবাহিকতায় বলেন : 'আল্লাহ্‌র শপথ, হে কুফ্‌রী অবলম্বনকারী গোষ্ঠী! আমার পরে খুব বেশিদিন না যেতেই–খুব অল্প দিনের মধ্যেই–একজন আরোহী তার বাহনের ওপর আরোহণ করবে[২৪] এবং তোমাদের জীবনে এমন এক অবস্থা নিয়ে আসবে যেন তোমরা যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছ। সে তোমাদের গভীর দুশ্চিন্তা, আতঙ্ক ও দিশেহারা অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করবে। আর এ হচ্ছে আমার নানার পক্ষ থেকে আমার পিতার মাধ্যমে আমার সাথে কৃত অঙ্গীকার। অতএব, তোমরা তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের সঙ্গীসাথীদের সিদ্ধান্ত নিয়ে আরেক বার পর্যালোচনা ও চিন্তাভাবনা করে দেখ যাতে কালের প্রবাহ তোমাদের ওপর দুঃখ ও দুশ্চিন্তা বর্ষণ না করে। আমি আমার বিষয়টি আল্লাহ্‌ তা'আলার ওপর সোপর্দ করেছি। আর আমি জানি যে, এ ধরণীর বুকে এমন কোন কিছুই ঘটে না যা তাঁর কুদরাতী হাতের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকতে পারে।

হে আল্লাহ্‌! তুমি এদের ওপর আসমান থেকে বারি বর্ষণ বন্ধ করে দাও। এদের ওপর লাঞ্ছনা ও দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দাও। আর সেই ছাক্বাফী গোলামকে[২৫] এদের ওপর প্রতিষ্ঠিত করে দাও যাতে সে এদের বিষের পেয়ালার আস্বাদন করাতে পারে এবং তাদের বিরুদ্ধে আমার, আমার সঙ্গীসাথিগণ, আহ্‌লে বাইত ও আমার অনুসারীদের (হত্যার– যা হতে যাচ্ছে) প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারে। কারণ, তারা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং অসহায় করে ফেলেছে। তুমি আমাদের রব; আমরা তোমার দিকেই মুখ করেছি এবং তোমার ওপর তাওয়াক্কুল করেছি, আর আমাদের প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে।[২৬]

ওমর বিন্‌ সা'দের পরিণতি সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী

এরপর হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) ইয়াযীদী বাহিনীর সেনাপতি ওমর বিন্‌ সা'দের খোঁজ করলেন, বললেন : 'ওমর বিন্‌ সা'দ্‌ কোথায়? ওকে আমার সামনে আসতে বল।'

ওমর বিন্‌ সা'দ্‌ যদিও ইমামের সামনে আসতে ইচ্ছুক ছিল না, তথাপি ইমাম তাকে আহ্বান করায় সে ইমামের সামনে এল। ইমাম হুসাইন তাকে বললেন : 'তুমি আমাকে হত্যা করবে? আমি মনে করি না যে, পিতৃপরিচয়হীনের পুত্র

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পিতৃপরিচয়হীন[২৭] রেই ও গোরগানের শাসনক্ষমতা তোমাকে অর্পণ করবে।[২৮] আল্লাহ্‌র শপথ, কখনই তা ঘটবে না। আমার এ অঙ্গীকার এমন এক অঙ্গীকার যেন তা বাস্তবায়িত হয়েই আছে। তুমি যা চাও তা করতে পার, কিন্তু জেনে রেখ, আমার (শাহাদাতের) পরে তুমি না দুনিয়ায়, না আখেরাতে– কোথাও আনন্দের মুখ দেখতে পাবে না। আমি যেন দেখতে পাচ্ছি, কুফার বুকে তোমার মাথা বর্শার ডগায় গেঁথে রাখা হয়েছে এবং শিশুরা তার ওপর পাথর নিক্ষেপ করছে ও সেটিকে লক্ষ্যস্থল বানিয়ে লক্ষ্যভেদ করছে।"[২৯]

এতে ওমর বিন্ সা'দ ক্রুদ্ধ হল এবং ইমাম হুসাইনের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। সে তার সৈন্যদের উদ্দেশে বলল : 'কিসের অপেক্ষা করছ? সবাই একযোগে ওর বিরুদ্ধে হামলা চালাও; ওরা মুষ্টিমেয় সংখ্যক বৈ তো নয়।'[৩০]

আশুরার দিনে ইমাম হুসাইনের তৃতীয় ভাষণ[৩১]

ইমাম হুসাইন (আ.) শত্রুবাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে তাদের সারিগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তারা তখন তরঙ্গের মতো গর্জন করছিল। এ সময় শত্রুবাহিনীর মধ্যে ওমর বিন্ সা'দ্‌সহ কুফার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এক জায়গায় অবস্থান করছিল। ইমাম হুসাইন তার দিকে তাকিয়ে বললেন :

'আমি আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা করছি, যিনি এ দুনিয়াকে সৃষ্টি করেছেন এবং একে অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল গৃহ বানিয়েছেন, আর দুনিয়াবাসীকে বিভিন্ন অবস্থার অধিকারী করেছেন। যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতারণার শিকার হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সে অজ্ঞ, আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট ও তার দ্বারা সম্মোহিত হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সে হতভাগ্য।

দুনিয়া যেন তোমাদের ধোঁকা না দেয়। কারণ, যে ব্যক্তিই দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ে দুনিয়া তারই আশাকে নিরাশায় পরিণত করে এবং যে ব্যক্তি তার লোভে পড়ে, দুনিয়া তাকে হতাশ করে দেয়। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমরা একটি কাজ সম্পাদনের জন্য এখানে একত্র হয়েছ যার মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ্‌কে অসন্তুষ্ট করেছ ও তাঁর ক্রোধ সঞ্চারের কারণ হয়েছ। তাই তিনি তোমাদের প্রতি বিরূপ হয়েছেন এবং তোমাদের জন্য তাঁর শাস্তি নাযিল (-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ) করেছেন, আর স্বীয় রহমত থেকে তোমাদের দূরে সরিয়ে দিয়েছেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আমাদের রব অত্যন্ত মহান। কিন্তু তোমরা অত্যন্ত খারাপ বান্দাহ্। তাই তাঁর আনুগত্যের অঙ্গীকার করেও এবং তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনলেও রাসূলের পরিবার-পরিজন ও বংশধরদের ওপর চড়াও হয়েছ এবং তাদের হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ। শয়তান তোমাদের ওপর বিজয়ী হয়েছে, তাই তোমরা মহান আল্লাহ্র কথা ভুলে গিয়েছ। তোমরা ধ্বংস হও। তোমরা যা চাচ্ছ সে ব্যাপারে আমি বলছি : ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজি'উন্।'[৩২]

এরা হচ্ছে এমন একটি জনগোষ্ঠী যারা ঈমান আনার পরে কাফের হয়েছে। দূর হোক আল্লাহ্র রহমত যালেমদের কাছ থেকে।'

এ সময় ওমর বিন্ সা'দ্ কুফার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্দেশে বলল : 'আফসোস তোমাদের জন্য যে, তোমরা তার সাথে কথোপকথন করছ! আল্লাহ্র শপথ, এ হচ্ছে সেই পিতার পুত্র যে, পুরো একদিনও যদি কথা বলতে চায়, কথা বলতে অক্ষম হবে না।'

তখন শিম্র্ ইমামের দিকে এগিয়ে এল এবং বলল : 'হে হুসাইন! তুমি এ কী সব কথা বলছ? তুমি আমাদের বুঝিয়ে দাও যাতে আমরা বুঝতে পারি।'

তখন ইমাম হুসাইন (আ.) বললেন : 'আমি বলছি যে, তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং আমাকে হত্যা কর না। কারণ, আমাকে হত্যা করা ও আমার অবমাননা করা তোমাদের জন্য জায়েয নয়। আমি তোমাদের রাসূলের কন্যার সন্তান এবং আমার নানী তোমাদের রাসূলের স্ত্রী খাদীজাহ্। হয়ত রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর এ উক্তি তোমাদের কাছে পৌঁছে থাকবে যে, তিনি এরশাদ করেছেন : হাসান ও হুসাইন বেহেশতে যুবকদের নেতা।'[৩৩]

মদীনা থেকে কারবালা : ইমাম হুসাইন (আ.)-এর স্লোগান

সাইয়্যেদুশ্ শুহাদা হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) মদীনা মুনাওয়ারাহ্ থেকে মক্কা মু'আযযামায় ও সেখান থেকে কুফার পথে কারবালায় পৌঁছা পর্যন্ত বিভিন্ন সময় এবং আশুরার দিনে কারবালার রণাঙ্গনে যে সব ভাষণ দেন ও বক্তব্য রাখেন সে সবের মধ্যে এমন কতকগুলো কথা আছে যা খুবই প্রভাববিস্তারকারী এবং সে সবে জিহাদ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ও আত্মমর্যাদার জন্য প্রেরণা সৃষ্টিকারী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর এ কথাগুলো ভাষণের অংশই হোক, বা কথোপকথনের অংশ বা স্লোগান হোক, নির্বিশেষে এগুলো এক ধরনের স্লোগানের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ সব স্লোগান থেকে হুসাইনী লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং আশুরা-কেন্দ্রিক চিন্তাধারা ও চেতনার সন্ধান পাওয়া যায়। এ কারণে তাঁর ভাষণ ও কথার এ অংশগুলোকে আশুরা আন্দোলনের স্লোগান বলে গণ্য করা চলে। এ স্লোগানগুলোর মধ্য থেকে কয়েকটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল :[৩৪]

١ . على الاسلام سلام اذ بليت الامة براع مثل يزيد.

১. 'উম্মাহ্ যখন ইয়াযীদের ন্যায় শাসকের কবলে পড়েছে তখন ইসলামকে বিদায়!'[৩৫]

হযরত ইমাম হুসাইন (আ.) মদীনায় মারওয়ান ইবনে হাকামের কথার জবাবে এ কথা বলেন।

٢. و الله لو لم يكن ملجا و لا ماوى لما بايعت يزيد بن معاوية.

২. 'আল্লাহ্র শপথ, এমনকি আমার যদি কোন আশ্রয়স্থলও না থাকত, তথাপি আমি ইয়াযীদের পক্ষে বাই'আত্ হতাম না।'[৩৬]

ইমাম হুসাইন তাঁর ভাই মুহাম্মাদ আল্-হানাফীয়ার কথার জবাবে এ কথা বলেন।

٣ . اني لا ارى الموت الا سعادة و الحياة مع الظالمين الا برما.

৩. 'অবশ্যই আমি মৃত্যুকে সৌভাগ্য এবং যালেমদের সাথে বেঁচে থাকাকে দুর্ভাগ্য ব্যতীত অন্য কিছু মনে করি না।'[৩৭]

ইমাম হুসাইন (আ.) কারবালায় তাঁর সঙ্গীসাথীদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে এ কথা বলেন।

٤ . الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على السنتهم يحوطونه ما درت معايشهم فاذا محصوا بالبلاء قل الديانون.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪. 'মানুষ হচ্ছে দুনিয়ার দাস, আর দীন তাদের কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যাতে তারা পার্থিব জীবনের সুবিধাদি দেখতে পায় যা তাদের ঘিরে রেখেছে। অতঃপর তারা যখন বিপদে নিপতিত হয় তখন খুব কম লোকই তা (সে বিপদকে) জয় করতে পারে।'[৩৮]

ইমাম হুসাইন কারবালায় যাওয়ার পথে যি হিসাম্ নামক স্থানে এ কথা বলেন।

٥. الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهى عنه؟ فليرغب المؤمن في لقاي ربه محقا.

৫. 'তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ না যে, সত্যের ভিত্তিতে কাজ করা হয় না এবং বাতিল থেকে বিরত থাকা হচ্ছে না? অতএব, (এহেন পরিস্থিতিতে) যথার্থভাবেই মু'মিনের উচিত তার রবের সাথে সাক্ষাতের জন্য আগ্রহী হওয়া।'[৩৯]

ইমাম কারবালায় স্বীয় সঙ্গী-সাথীদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে এ কথা বলেন।

٦. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة.

৬. 'আদম-সন্তানদের গলায় মৃত্যুর দাগ কেটে দেওয়া হয়েছে (অবধারিত করে দেওয়া হয়েছে) যেভাবে যুবতীদের গলায় হারের দাগ কেটে থাকে।'[৪০]

ইমাম হুসাইন মক্কা ত্যাগের প্রাক্কালে তাঁর কাছে সমবেত তাঁর কতক বন্ধুবান্ধব, পরিবারের সদস্য, সঙ্গীসাথী, অনুসারী ও উপস্থিত জনতার উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে এ কথা বলেন।

٧. من راى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله، ناكثاً عهده، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالاثم و العدوان فلم يغير عليه بفعل و لا قول كان حقاً على الله ان يدخله مدخله.

৭. 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কৃত হারামকে হালালকারী, তাঁর (আল্লাহ্র গৃহীত) অঙ্গীকার ভঙ্গকারী ও রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর সুন্নাতের বিরোধিতাকারী কোন নিপীড়ক শাসককে আল্লাহ্র বান্দাহ্দের মধ্যে পাপাচার ও দুর্বৃত্তপনা করতে দেখে, সে যদি তার কাজ বা কথার মাধ্যমে তাকে প্রতিহত না করে, তাহলে আল্লাহ্র জন্য দায়িত্ব হয়ে যায় যে,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাকে (প্রতিহতকরণে বিরত ব্যক্তিকে) তার (নিপীড়ক শাসকের) প্রবেশদ্বার দিয়ে (জাহান্নামে) প্রবেশ করাবেন।'[৪১]

কুফার পথে অবস্থিত বাইযাহ্ নামক মনযিলে হূর্ বিন্ ইয়াযীদের নেতৃত্বাধীন বাহিনীর উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে ইমাম এ কথা বলেন।

٨. ما الامام الا العامل بالكتاب و الآخذ بالقسط و الدائن بالحق و الحابس نفسه على ذات الله.

৮. 'ঐ ব্যক্তি ছাড়া কেউ সত্যিকারের ইমাম হতে পারে না যে (আল্লাহ্র) কিতাব অনুযায়ী আমল করে, ন্যায়সঙ্গতভাবে (কর) গ্রহণ করে, সত্যের ভিত্তিতে (সুদমুক্ত) ঋণ প্রদান করে এবং আল্লাহ্র সত্তার কাছে স্বীয় প্রবৃত্তিকে বন্দী করে রাখে।'[৪২]

ইমাম হুসাইন কুফাবাসীর দাওয়াতের জবাবে সত্যিকারের ইসলামী নেতা ও শাসকের গুণাবলি বর্ণনা করে মুসলিম ইবনে 'আক্বীলের মাধ্যমে তাদের কাছে প্রেরিত পত্রে এ কথা বলেন।

٩. سامضى و ما بالموت عار على الفتى

اذا ما نوى حقا و جاهد مسلما.

৯. 'অচিরেই গত হব; কিবা লাজ মৃত্যুতে যুবকের
লক্ষ্য যবে সত্য, আর লড়ে যবে মুসলিম রূপে।'[৪৩]

এটি একজন কবির কবিতার উদ্ধৃতি। ইমাম কুফার পথে হূর্ বিন্ ইয়াযীদের হুমকির জবাবে এটি আবৃত্তি করেন।

١٠. رضي الله رضانا اهل البيت، نصبر على بلائه و يوفينا اجر الصالحين.

১০. 'আল্লাহ্র সন্তুষ্টিতেই আমাদের আহ্লে বাইতের সন্তুষ্টি; আমরা তাঁর পক্ষ থেকে আগত পরীক্ষায় ধৈর্য ধারণ করব এবং তিনি অবশ্যই আমাদের তাঁর নেক বান্দাহ্দের জন্য প্রতিশ্রুত পুরস্কার প্রদান করবেন।'[৪৪]

ইমাম হুসাইন মক্কা থেকে বহির্গত হওয়ার প্রাক্কালে স্বীয় সঙ্গী-সাথী ও স্বজনদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে এ কথা বলেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

١١. انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي.

১১. 'অবশ্যই আমি কেবল আমার নানার উম্মাতের সংশোধনের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়েছি।'[৪৫]

ইমাম মদীনা ত্যাগের প্রাক্কালে তাঁর ভাই মুহাম্মাদ বিন আল্-হানাফিয়ার উদ্দেশে লিখিত অসিয়তনামায় এ কথা বলেন।

١٢.لا اعطيكم بيدي اعطاء الذليل

و لا اقر اقرار العبيد و لا افر فرار العبيد

১২. 'তোমাদের হাতে দেব না'ক কভু লাঞ্ছিতের হাত
করব না কভু জেন দাসের অঙ্গীকার/
পালিয়ে যাব না কভু ক্রীতদাস সম।"[৪৬]

আশুরার দিনে দুশমন-বাহিনীর সামনে প্রদত্ত ভাষণে তাদের পক্ষ থেকে বাই'আত্-দাবির জবাবে ইমাম হুসাইন এ কথা বলেন।

١٣. هيهات منا الذلة، يابي الله ذلك لنا و رسوله و المؤمنون.

১৩. 'দূর হোক লাঞ্ছনা আমাদের থেকে; আল্লাহ্, তাঁর রাসূল ও মু'মিনগণ এটা আমাদের জন্য অপছন্দ করেন।'[৪৭]

দুশমন পক্ষ ইমাম হুসাইনকে আত্মসমর্পণ বা নিহত হওয়া– এ দু'টির যে কোন একটি বেছে নিতে বললে এবং তৃতীয় কোন পথ খোলা না থাকায় তিনি আশুরার দিনে দুশমনদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে এ কথা বলেন।

١٤. فهل هو الا الموت؟ فمرحباً به.

১৪. 'মৃত্যু ছাড়া আর কী হবে? অতএব, তাকে স্বাগতম!'[৪৮]

ইমামকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানিয়ে লেখা ওমর্ বিন্ সা'দের পত্রের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

١٥. صبرا بني الكرام، فما الموت الا قنطرة تعبر بكم عن البوس و الضراء الى الجنان الواسعة و النعيم الدائمة.

১৫. 'মহানুভবতার ভিত্তি হচ্ছে ধৈর্য; আর মৃত্যু দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষয়ক্ষতির ওপর দিয়ে পার হয়ে সুবিস্তৃত ও চিরস্থায়ী নে'আমতে পরিপূর্ণ বেহেশতে উপনীত হওয়ার পুল ছাড়া অন্য কিছু নয়।'[৪৯]

ইমাম হুসাইনের কয়েক জন সঙ্গীর শাহাদাতের পর আশুরার দিন সকালে আত্মোৎসর্গী অন্যান্য সঙ্গীসাথীর উদ্দেশ প্রদত্ত ভাষণে তিনি এ কথা বলেন।

١٦. موت في عز خير من حياة في ذل.

১৬. 'লাঞ্ছনার জীবনের চেয়ে সম্মান সহকারে মৃত্যুই শ্রেয়।'[৫০]

١٧. لم يكن لكم دين و كنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرار في دينكم.

১৭. 'তোমাদের কোন দীন নেই এবং তোমরা পরকালকে ভয় করছ না, সুতরাং তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে স্বাধীন হয়ে যাও।'[৫১]

ইমামের শাহাদাতের পূর্বে ইয়াযীদী বাহিনী তাঁর পক্ষের নারীদের তাঁবুতে হামলা চালালে তিনি তাদের সম্বোধন করে এ কথা বলেন।

١٨.هل من ناصر ينصر ذرِية الاطهار؟

১৮. '(রাসূলুল্লাহ্‌র) পবিত্র বংশধরকে সাহায্য করবে এমন কোন সাহায্যকারী আছে কি?'[৫২]

অসুস্থ ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) ছাড়া ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সকল পুরুষ সঙ্গী ও আত্মীয় শহীদ হলে ইমাম এ আহ্বান জানান।

١٩. هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟

১৯. 'এমন কোন বিগলিতপ্রাণ আছে কি যে রাসূলের হারামের জন্য বিগলিত হবে?'[৫৩]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) ছাড়া হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর সকল পুরুষ সঙ্গী ও আত্মীয় শহীদ হলে ইমাম এ আহ্বান জানান।

٢٠. اني لم اخرج اشرا و لا بطرا ولا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي (ص) اريد ان آمر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسير بسيرة جدي و ابي علي بن ابي طالب.

২০. 'আমি একগুঁয়েমির বশবর্তী হয়ে বা পার্থিব আরাম-আয়েশের জন্য বা বিশৃঙ্খলার উদ্দেশ্যে অথবা যুলুম-অত্যাচারের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইনি; বরং আমি আমার নানার উম্মাতের সংশোধনের চেষ্টা চালানোর উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়েছি; আমি ভাল কাজের আদেশ দান ও মন্দ কাজ প্রতিহত করতে এবং আমার নানার ও আমার পিতা আলী বিন্ আবি তালিবের জীবনাচরণের অনুসরণ করতে চাই।'[৫৪]

আশুরার স্লোগানের শিক্ষা

উপর্যুক্ত নূরানী ও বীরত্বব্যঞ্জক বাক্যগুলো সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর আন্দোলনের স্লোগান হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ বাক্যগুলো পর্যালোচনা করলে নিম্নোক্ত তথ্য ও শিক্ষাসমূহ পাওয়া যায় :

১. ইয়াযীদী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কোন শাসক শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা ইসলামের ধ্বংসের নামান্তর।

২. ইয়াযীদের ন্যায় যে কোন লোকের অনুকূলে বাই'আত্ হওয়া হারাম।

৩. লাঞ্ছনার জীবনের তুলনায় শহীদী মৃত্যু অধিকতর মর্যাদার।

৪. ঈমানের কঠিন পরীক্ষার মোকাবিলায় টিকে থাকে এমন প্রকৃত মুসলমানের সংখ্যা খুবই কম।

৫. বাতিল শক্তি ক্ষমতাসীন থাকার যুগে শাহাদাতকামী লোকদের উপস্থিতি অপরিহার্য।

৬. মানুষের জন্য শাহাদাত হচ্ছে অলঙ্করণস্বরূপ।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৭. শক্তিমদমত্ত ও খোদাদ্রোহী দুর্বৃত্ত শক্তির আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অপরিহার্য।

৮. কুরআন অনুযায়ী চলা ও ন্যায়বিচার ইসলামী নেতৃত্বের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য।

৯. আল্লাহ্ তা'আলার ইচ্ছার সামনে আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্ট থাকা অপরিহার্য।

১০. সত্যকামী আন্দোলনে শাহাদাতকামীদের সাথে থাকা অপরিহার্য।

১১. স্বাধীনচেতা ও মু'মিন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য লাঞ্ছনার সামনে মাথা পেতে দেওয়া হারাম।

১২. মৃত্যু হচ্ছে নে'আমতে পরিপূর্ণ বেহেশ্‌তে পৌঁছার পুল স্বরূপ।

১৩. স্বাধীনচেতা হওয়া ও মহানুভবতা ঈমানদারদের বিশেষ গুণ।

১৪. সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সব সময়ই ও সকলের কাছেই সাহায্য চাওয়া প্রয়োজন।

বস্তুত আশুরা তথা সাইয়্যেদুশ শুহাদা হযরত ইমাম হুসাইন (আ.)-এর শাহাদাতের ঘটনার স্মৃতি যে হাজার বছরেরও বেশিকাল যাবৎ অমর হয়ে আছে তা তাঁর বাণীতে প্রতিফলিত এসব মহান ও সমুন্নত শিক্ষার কারণেই। এ কারণেই যুগে যুগে যুলুম-নির্যাতন ও নিপীড়নবিরোধী এবং স্বৈরতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনসমূহ কারবালার ঘটনা থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা গ্রহণ করেছে। কবির ভাষায় :

درس آزادی به دنیا داد رفتار حسین

بذر همت در جهان افشاند، افکار حسین

گـر نداری دین به عالم، لا اقل آزاده باش

این کلام نغز می باشد ز گـفتار حسین

مرگ با عزت ز عیش در مذلت بهتر است

نغمه ای می باشد از لعل درّ بار حسین.

বিশ্বে দিল শিক্ষা আযাদীর হুসাইনের আচরণ
হুসাইনী চিন্তায় হিম্মত-বীজে ভরে গেল এ ভূবন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

না যদি থাকে ধর্ম তোমার, স্বাধীন হয়ে বাঁচ তবু
এ অমূল্য বাণী মনে রেখ, হুসাইনের এ কথন
লাঞ্ছিত জীবন নয়, মর্যাদা নিয়ে মৃত্যুবরণও ভাল
হুসাইনী ভাণ্ডারে বহু পাবে তুমি মণিমুক্তা এমন ।[৫৫]

অনুবাদ : নূর হোসেন মজিদী

তথ্যসূত্র

১. সূরা আল্-মায়েদাহ্ : ৬৩
২. সূরা আল্-মায়েদাহ্ : ৭৮-৭৯
৩. সূরা আল্-মায়েদাহ্ : ৪৪
৪. সূরা আত্-তাওবাহ্ : ৭১
৫. তুহাফুল 'উকূল
৬. نواويس – কারবালার নিকটবর্তী একটি গ্রাম; হুর্ বিন্ ইয়াযীদের কবর সেখানে অবস্থিত ।
৭. ক্বেচ্ছেয়ে কার্বালা, পৃ. ১৪৮; আল্-লুহূফ্, পৃ. ২৫
৮. কিতাবুল ইরশাদ : শেখ মুফীদ, পৃ. ৯৩
৯. সূরা ইউনুস : ৭১
১০. সূরা আল্-আ'রাফ : ১৯৬
১১. অর্থাৎ বনি উমাইয়্যাহ্র ।– অনুবাদক
১২. স্মর্তব্য, হযরত হামযাহ্ ছিলেন ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পিতার চাচা, আর আরব রীতি অনুযায়ী পিতার চাচাকেও 'চাচা' বলা হয় ।– অনুবাদক
১৩. হায়াতুল ইমামিল্ হুসাইন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৮৪
১৪. و الله لا اعطيكم بيدي اعطأ الذليل و لا افر فرار العبيد. বাক্যের শেষাংশের পাঠান্তর : ولا اقر قرار العبيد. – 'আর আমি গোলামের অঙ্গীকারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হব না ।'
১৫. কিতাবুল ইরশাদ : শেখ মুফীদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৭

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১৬. এখানে ইমাম হুসাইন (আ.) তাঁর পিতা হযরত আলী (আ.)-এর খেলাফতের যুগের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যখন কুফা ছিল তাঁর রাজধানী এবং কুফার লোকেরা তাঁর অনুগত ছিল ।– অনুবাদক

১৭. ইমাম হুসাইন এখানে আহ্যাবের যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যে যুদ্ধে আরবের বিভিন্ন মুশরিক গোষ্ঠী (احزاب। – দলসমূহ) ঐক্যবদ্ধভাবে হযরত রাসূলে আকরাম (সা.)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল যাতে অবশ্য তারা সফল হয়নি ।– অনুবাদক

১৮. এখানে ইমাম (আ.) ইয়াযীদী পক্ষভুক্ত সাবেক ইয়াহুদী ও সাবেক খ্রিস্টানদের বুঝাতে চেয়েছেন বলে মনে হয় ।– অনুবাদক

১৯. এখানেও তিনি সাবেক ইয়াহুদী ও সাবেক খ্রিস্টানদের বুঝাতে চেয়েছেন বলে মনে হয় ।– অনুবাদক

২০. স্মর্তব্য, জারজ সন্তানের পিতৃপরিচয়ে পরিচিত করা নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আবু সুফিয়ানের জারজ সন্তান (কারবালার ঘটনার সময় কুফার প্রশাসক ওবায়দুল্লাহ্‌র পিতা) যিয়াদকে আমীর মু'আবিয়াহ্ তাঁর ভাই বলে পরিচয় দিতেন; সম্ভবত ইমাম এ দিকেই ইঙ্গিত করেছেন ।– অনুবাদক

২১. এখানে ইমাম হুসাইন (আ.) সিফ্‌ফীনের যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন বলে মনে হয় যখন হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার মুখে আমীর মু'আবিয়াহ্‌র নির্দেশে তাঁর সৈন্যরা বর্শার মাথায় কুরআন ঝুলিয়ে যুদ্ধবিরতির জন্য আবেদন জানায় এবং হযরত আলীর সৈন্যদের মধ্যকার একটি বিরাট অংশ অজ্ঞতাবশত এতে প্রতারিত হয়ে তাঁকে, তাদের ভাষায়, 'কুরআনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' না করার জন্য চাপ দেয় এবং এর ফলে তিনি যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য হন– যে যুদ্ধবিরতির বিষময় পরিণতি মুসলিম উম্মাহ্ আজও বহন করে চলেছে। এভাবে যুদ্ধ বন্ধের জন্য হযরত আলী (আ.)-এর ওপর চাপ সৃষ্টিকারীরা পরবর্তীকালে তাঁকে পরিত্যাগ করে যায় এবং 'খারেজী' নামে পরিচিত হয় ।– অনুবাদক

২২. কারবালার ঘটনার সময় কুফার প্রশাসক ওবায়দুল্লাহ্ বিন্ যিয়াদ ।–অনুবাদক

২৩. তুহাফুল 'উকূল্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৭৪; আল্-ইহ্‌তিজাজ্, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯৯; মাক্বতালুল্ হুসাইন : খারাযমী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৬ ।

২৪. ইমাম হুসাইন এখানে তাঁর শাহাদাতের পরে অচিরেই মুখতার ছাক্বাফী যে অভ্যুত্থান করেন এবং কারবালার যালেমদের বিরুদ্ধে নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন সে সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন ।– অনুবাদক

২৫. অর্থাৎ মুখতারকে ।– অনুবাদক

২৬. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ৯

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২৭. কুফার প্রশাসক ওবায়দুল্লাহ্ বিন্ যিয়াদ।

২৮. ওবায়দুল্লাহ্ বিন্ যিয়াদ ওমর বিন্ সা'দকে এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং এ লোভেই সে হযরত ইমামের হুসাইনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।– অনুবাদক

২৯. ইমাম হুসাইনের এ ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবায়িত হয়েছিল।– অনুবাদক

৩০. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ১০

৩১. আশুরার দিনে ইমাম হুসাইন (আ.) কয় বার রণাঙ্গনে আসেন এবং শত্রুবাহিনীর উদ্দেশে ভাষণ দেন ইতিহাসে তা পুরোপুরি সুস্পষ্ট নয়। আমরা এখানে তাঁর তিনটি ভাষণ উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু এটা নিশ্চিত করে বলা কঠিন যে, তিনি কি যথেষ্ট পরিমাণে বিরতি সহকারে বিভিন্ন সময় এসে এ ভাষণগুলো দিয়েছেন, নাকি এগুলো একই ভাষণেরই বিভিন্ন অংশ এবং ঐতিহাসিকগণ এগুলোকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, তিনি আশুরার দিনে শত্রুবাহিনীকে সম্বোধন করে তিন বারের বেশি ভাষণ প্রদান করেন। (ওয়াসিলাতুদ্-দারাইন : ২৯৮)

৩২. 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্র জন্য (সৃষ্ট হয়েছি) এবং নিশ্চয়ই আমরা তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তনরত।' (সূরা আল্-বাক্বারাহ্ : ১৫৬)

৩৩. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ৫

৩৪. ইমাম হুসাইন (আ.)-এর নিম্নোক্ত স্লোগানমূলক কথাগুলো সরাসরি আরবি থেকে অনূদিত হয়েছে।– অনুবাদক

৩৫. মাওসূ'আতু কালামাতিল্ ইমাম আল্-হুসাইন, পৃ. ২৮৪

৩৬. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ৩২৯; আ'ইয়ানুশ্ শি'আহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৮৮

৩৭. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৮১

৩৮. তুহাফুল 'উকূল, জামে'আহ্ মুদার্‌রেসীন কর্তৃক প্রকাশিত সংস্করণ, পৃ. ২৪৫; বিহারুল আনওয়ার, ৭৫তম খণ্ড, পৃ. ১১৭

৩৯. মানাক্বিব : ইবনে শাহ্র আশূব, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৮

৪০. আল্-লহূফ্, পৃ. ৫৩; বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬

৪১. ওয়াক্ব'আতু আল্তাফ্, পৃ. ১৭২; মাওসূ'আতু কালামাতিল ইমাম আল্-হুসাইন, পৃ. ৩৬১

৪২. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৩৪

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮

৪৪. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ৩৬৬; আ'ইয়ানুশ্ শি'আহ্, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৩৯

৪৫. মানাক্বিব্ : ইবনে শাহ্র্ আশূব্, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৮৯

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৪৬. মাক্বতালুল্ হুসাইন : মুক্বরিম্, পৃ. ২৮০। [দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তিটির দু'টি পাঠ রয়েছে; এখানে দু'টিই উদ্ধৃত হয়েছে।]

৪৭. নাফাসুল্ মাহ্মুম্, পৃ. ১৩১; মাক্বতাল : খারাযমী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৭

৪৮. মাওসূ'আতু কালামাতিল্ ইমাম আল্-হুসাইন, পৃ. ৩৮২

৪৯. নাফাসুল্ মাহ্মুম্, পৃ. ১৩১; মা'আনিল্ আখবার্, পৃ. ২৮৮

৫০. বিহারুল আনওয়ার, ৪৪তম খণ্ড, পৃ. ১৯২

৫১. প্রাগুক্ত, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ৫১

৫২. যুর্‌রিয়্যাতুন্ নাজাহ্, পৃ. ১২৯

৫৩. বিহারুল আনওয়ার, ৪৫তম খণ্ড, পৃ. ৪৬

৫৪. মাক্বতাল্ : খারাযমী, ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৮

৫৫. হুসাইন পিশ্‌ভয়ে এন্‌সান্‌হা, পৃ. ৭০। [কবিতাটি ফাযলুল্লাহ্ সালাওয়াতী কর্তৃক রচিত।]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য শোক পালন

আলী আসগার রেজওয়ানী

কেন আমরা আল্লাহ্‌র ওলীদের শোকে মাতম করব? তাঁরা কি আমাদের শোক পালনের মুখাপেক্ষী? কেন আমরা অতীতের ঘটনাসমূহের স্মরণ করব? ওয়াহাবীরা এরূপ কর্মকে 'বিদআত' বলে জানে এবং এরূপ কর্মের জন্য সমালোচনা ও নিন্দা করে থাকে।[১]

এখানে আমরা উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রথমে আজাদারী বা শোক পালনের দলিলসমূহ উপস্থাপন করছি।

শোক পালন ভালবাসা ও ঘৃণার প্রকাশ

ভালবাসা ও বিদ্বেষ– এ দু'টি বৈশিষ্ট্য মানুষের মধ্যে রয়েছে। এ দু'টি বিষয় কারও প্রতি আকর্ষণ বা বিকর্ষণের আত্মিক রূপ।

যাদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা অপরিহার্য

বুদ্ধিবৃত্তিক ও বর্ণনাগত (কুরআন ও হাদীসভিত্তিক) দলিলের ভিত্তিতে কারও কারও প্রতি ভালবাসা পোষণ করা অপরিহার্য। যেমন :

১. আল্লাহ্‌ : মহান আল্লাহ্‌ যেহেতু সকল পূর্ণতার গুণাবলিতে গুণান্বিত ও সকল ত্রুটি হতে মুক্ত এবং সকল সৃষ্টি তাঁর ওপর সত্তাগতভাবে নির্ভরশীল। তাই তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রকৃতিগত। ধর্মীয় নির্দেশেও তাঁর প্রতি ভালবাসা পোষণের ইঙ্গিত রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾

'বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রী, তোমাদের বংশ ও গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান-যা তোমরা পছন্দ কর-আল্লাহ্‌, তাঁর রাসূল ও তাঁর পথে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর আল্লাহ্‌র বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ্‌ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।'[২]

২. আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) : অপর যাঁকে আল্লাহ্‌র কারণে আমাদের অবশ্যই ভালবাসতে হবে তিনি হলেন তাঁর রাসূল। কারণ, তিনি মহান আল্লাহ্‌র অস্তিত্বগত (তাকভীনি) ও বিধানগত (তাশরীয়ি) উভয় রহমত অবতীর্ণের মাধ্যম। এ কারণেই উক্ত আয়াতে আল্লাহ্‌র পাশাপাশি তাঁর নাম এসেছে এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মহানবী (সা.) বলেছেন :

أَحِبُّوا اللهَ لِمَا يَغْذُوْكُمْ وَ أَحِبُّوْنِيْ بِحُبِّ اللهِ

'আল্লাহ্‌কে এ জন্য ভালবাস যে, তিনি তোমাদের জীবিকা দেন এবং আমাকে আল্লাহ্‌র কারণে ভালবাস।'[৩]

অন্যদিকে মহানবী (সা.)-এর মধ্যে যে পরিপূর্ণ গুণাবলি ছিল তার কারণে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত এবং তাঁর ভালবাসা তাদের হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছিল।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩. মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বংশধর : রাসূলের পবিত্র বংশধরদের প্রতি ভালবাসা পোষণ করাও অপরিহার্য। কারণ, তাঁরা উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ও পূর্ণতার গুণসম্পন্ন হওয়া ছাড়াও আল্লাহ্‌র সকল আধ্যাত্মিক ও বস্তুগত নিয়ামতের মাধ্যম হলেন তাঁরা। এ কারণেই রাসূল তাঁদের ভালবাসার নির্দেশ দিয়েছেন।

মহানবী (সা.) পূর্বোক্ত হাদীসটিতে আরো বলেছেন :

...وَ أَحِبُّوْا أَهْلَ بَيْتِيْ لِحُبِّيْ

'আমার বংশধরদের আমার ভালবাসার কারণে ভালবাস।'

আল্লাহ্‌র রাসূলের বংশধরদের রাসূলের ন্যায় ভালবাসার সপক্ষে দলিল

১. রাসূলের বংশধরগণ রাসূলের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা বিশেষ মর্যাদার। এ কারণেই রাসূল (সা.) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন সকল সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে, শুধু আমার সাথে সম্পর্ক ব্যতীত।'

২. আল্লাহ্‌র রাসূলের বংশধরগণ আল্লাহ্‌র বিশেষ ভালবাসার পাত্র। এ বিষয়টি হাদীসে কিসাসহ[৪] অন্যান্য হাদীসে এসেছে।

৩. মুহাম্মদ (সা.)-এর রিসালাতের প্রতিদান তাঁর আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষণের মাধ্যমে দেওয়া হয়। যেমনটি মহান আল্লাহ্‌ বলেছেন-

قُلْ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِيْ الْقُرْبَى

'বলুন, আমি আমার রিসালাতের দায়িত্ব পালনের বিপরীতে কোন প্রতিদান চাই কেবল আমার রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয়ের প্রতি ভালবাসা পোষণ ছাড়া।'[৫]

৪. কিয়ামতের দিন রাসূলের আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসার বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। মহান আল্লাহ্‌ বলেন, وَقِفُوْهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُوْلُوْنَ 'তাদেরকে থামাও, তারা জিজ্ঞাসিত হবে।'[৬]

উপরিউক্ত আয়াতের বিষয়ে সিবতে ইবনে জাওযী মুজাহিদ হতে বর্ণনা করেছেন, 'কিয়ামতের দিন হযরত আলীর প্রতি ভালবাসা পোষণের বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।'[৭]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৫. মহানবীর আহলে বাইত পবিত্র কুরআনের সমকক্ষ হিসাবে সম্মানের ও ভালবাসার পাত্র। যেমনটি হাদীসে সাকালাইনে বলা হয়েছে-

إِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللهِ وَ عِتْرَتِيْ أَهْلَ بَيْتِيْ إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوْا أَبَداً... فَانْظُرُوْا هُمْ تَخْلِفُوْنِيْ فِيْهِمَا

'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি ভারী (মূল্যবান) বস্তু রেখে যাচ্ছি : আল্লাহ্‌র কিতাব (কুরআন) ও আমার রক্ত সম্পর্কীয় নিকটাত্মীয় (আহলে বাইত)। যদি তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে ধর কখনই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হবে না... লক্ষ্য রেখ, তাদের ক্ষেত্রে আমার সম্মান রক্ষা কর।'

৬. আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা সুন্নী-শিয়া উভয় সূত্রে সহীহ হাদীস মতে ঈমানের শর্ত। এ কারণেই মহানবী (সা.) হযরত আলীকে বলেছেন, 'হে আলী! তোমাকে মুমিন ব্যতীত ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ব্যতীত তোমার প্রতি কেউ বিদ্বেষ পোষণ করবে না।'

৭. আহলে বাইত রাসূলের উম্মতের মুক্তির তরী। শিয়া-সুন্নী উভয় সূত্রে মহানবী (সা.) হতে বর্ণিত হয়েছে, 'আমার আহলে বাইতের দৃষ্টান্ত তোমাদের মাঝে নূহের তরণীর ন্যায়, যে তাতে আরোহণ করবে মুক্তি পাবে এবং যে না উঠবে নিমজ্জিত ও ধ্বংস হবে।'

৮. আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা আমল কবুলের শর্ত। হযরত মুহাম্মাদ (সা.) হযরত আলীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'যদি আমার উম্মত এতটা রোজা রাখে যে, তাতে তাদের কোমর বাঁকা হয়ে ধনুকের মত হয়, এতটা নামাজ পড়ে যে সূতায় পরিণত হয়, কিন্তু অন্তরে তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তবে আল্লাহ্‌ তাদের মুখে জাহান্নামের আগুন লেপ্টে দিবেন অর্থাৎ তাদের দোযখে নিক্ষেপ করবেন।'[৮]

উক্ত হাদীসসমূহ হতে আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শোকানুষ্ঠান পালন তাঁদের প্রতি ভালবাসারই প্রকাশস্বরূপ।

বুদ্ধিবৃত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য ক্রন্দন

১. আল্লাহ্‌র নবীর আহলে বাইতের জন্য (বিশেষত ইমাম হুসাইনের জন্য) ক্রন্দন তাঁদের প্রতি ভালবাসার প্রকাশ এবং বুদ্ধিবৃত্তি তা সমর্থন করে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২. আহলে বাইতের জন্য অশ্রু বর্ষণ বিশেষত ইমাম হুসাইনের জন্য অশ্রুত্যাগ আল্লাহ্‌র নিদর্শনকে জাগরুক করার ও তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতীক।

৩. ইমাম হুসাইনের জন্য ক্রন্দন প্রকৃতপক্ষে পূর্ণতার সকল গুণের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাবর্তনের শামিল। কারণ, ইমাম হুসাইনের প্রতি ভালবাসা নিছক ব্যক্তিকেন্দ্রিক কোন বিষয় নয়; বরং ইসলামের পূর্ণতার সকল দিক তাঁর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল এবং তিনি আল্লাহর দীনকে পুনরুজ্জীবিত করতে মজলুমভাবে শহীদ হয়েছেন। তাঁর জন্য ক্রন্দন মূলত সত্য ও ন্যায়ের জন্যই ক্রন্দন। তাঁর শাহাদাতের মাধ্যমেই সত্য ও ন্যায় প্রকাশিত হয়। তাঁর লক্ষ্য ও কর্মপদ্ধতির পরিচয় লাভের মাধ্যমেই ইসলামের পরিচয় লাভ করা যায়। আর তাই হাদীসে তাঁর শাহাদাতের স্মরণে ক্রন্দনের সওয়াব সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যে কেউ ইমাম হুসাইনের জন্য ক্রন্দন করবে অথবা কাউকে কাঁদাবে অথবা অন্তত কান্নার ভাব করবে, তার জন্য বেহেশ্‌ত ওয়াজিব হবে।' কারণ, ইমাম হুসাইনের পরিচয় এবং তাঁর অবিস্মরণীয় কর্মের সাথে পরিচয় লাভের ফলে মানুষ আল্লাহ্‌র প্রতি প্রত্যাবর্তন ও তাঁর জন্য আত্মত্যাগে উৎসাহিত হয়।

৪. মানুষ যতক্ষণ তার অভ্যন্তরীণ সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তন না করে এবং আল্লাহ্‌র বিশেষ বান্দার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত না করে ততক্ষণ তার অন্তর নরম হয় না, তার কান্নাও আসে না। তাই ইমাম হুসাইনের মত ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করার মাধ্যমে মানুষ যখন নিজের দিকে প্রত্যাবর্তন করে তখন সে মূলত নিজ সীমিত অন্তরের সঙ্গে অসীম এক অন্তরের সম্পর্ক স্থাপন করে। সুস্পষ্ট যে, এরূপ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে মানুষ অসীমের সাথে সংযুক্ত হয়। যেমনভাবে, কোন ক্ষুদ্র গর্তে জমা পানিকে যদি অসীম সমুদ্রের সাথে সংযুক্ত করা না হয় ঐ স্বল্প পানি অসীমের সংস্পর্শ ছাড়া দুর্গন্ধময় হয়ে যায় অথবা রৌদ্রতাপে শুকিয়ে যায়। কিন্তু যদি ঐ ক্ষুদ্র পানিকেই মহাসমুদ্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হয় তবে ঐ ক্ষুদ্র পানিটুকুই সকল প্রকার কলুষতা থেকে মুক্ত ও ধ্বংস হতে রক্ষা পায়।

৫. মজলুম ব্যক্তির (যার প্রতি অবিচার ও অন্যায় করা হয়েছে ও তার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে) জন্য ক্রন্দন মানুষকে তার প্রতি সহানুভূতিশীল করে, ফলে সে নিজেকে ঐ মজলুমের সপক্ষ ভাবে, বিশেষত ঐ মজলুম যদি কোন নবী, তাঁর স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি ও নিষ্পাপ কোন ব্যক্তি হয়, তাহলে তাঁর প্রতি ভালবাসা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পোষণকারী ব্যক্তি শরীয়ত ও তাঁর আনীত দীনের রক্ষক হওয়ার ব্রত নেয়। মনস্তত্ত্ববিদগণ এ বিষয়টি সমর্থন করেন। তাই আমরা ইতিহাসের পরিক্রমায় লক্ষ্য করি আহলে বাইতের অনুসারীরা ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের শোকাবহ ঘটনা হতে আত্মজাগরণের সর্বোচ্চ শিক্ষাগ্রহণের কারণে সবসময়ই নির্যাতিত ও মজলুমের সমর্থক হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

৬. আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য ক্রন্দন বিশেষত ইমাম হুসাইনের জন্য ক্রন্দন দগ্ধ হৃদয়ের জন্য প্রশান্তির কারণ। ইমাম হুসাইনের ওপর আপতিত মুসিবতের স্মরণে হৃদয়ে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হয় তাঁর জন্য অশ্রু বিসর্জন ঐ দগ্ধ হৃদয় উপশমে সাহায্য করে।

৭. আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য ক্রন্দন মানুষের হৃদয়কে নরম করে তাদের হৃদয় হতে কলুষকে দূর করে। ফলে তার হৃদয় ঐশী নূরে আলোকিত হওয়ার সুযোগ পায়। ঐ অশ্রু তার অন্তরের মরিচা দূর করতে সাহায্য করে।

৮. ইমাম হুসাইনের জন্য ক্রন্দন অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে এক প্রকার বাস্তব সংগ্রাম। এর মাধ্যমে ঘোষণা করা হয় অত্যাচারী শাসকদের আচরণের প্রতি আমরা বীতশ্রদ্ধ ও ক্রন্দন তাদের প্রতি ঘৃণার প্রকাশ।

৯. আহলে বাইতের অনুসারীরা আহলে বাইতের, বিশেষত শহীদদের নেতা ইমাম হুসাইনের জন্য ক্রন্দনের মাধ্যমে ঘোষণা করে : আমরা ইতিহাসের পরিক্রমায় ইয়াযীদ ও ইয়াযীদের অনুসারীদের বিরোধী এবং ইমাম হুসাইন ও তাঁর মত ব্যক্তিত্বদের পক্ষে আছি। এ লক্ষ্যেই তারা ইমাম হুসাইনের স্মরণকে জাগরুক রাখে।

আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য ক্রন্দন জায়েয হওয়ার সপক্ষে দলিল

হাদীস ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহ অধ্যয়নে আমরা দেখি দীনের ধারক-বাহকগণ আল্লাহ্‌র ওলীদের শোকে ক্রন্দন করেছেন। এখানে এরূপ কিছু নমুনা আমরা তুলে ধরছি।

১. তাবারী নিজ সূত্রে হযরত আলী হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, 'যখন কাবিল স্বীয় ভ্রাতা হাবিলকে হত্যা করে তখন হযরত আদম (আ.) তাঁর শোকে ক্রন্দন করেছেন।'[৯]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২. তাবারী বর্ণনা করেছেন, হযরত ইয়াকুব হতে হযরত ইউসুফের বিচ্ছিন্ন থাকার সময়কাল ছিল আশি বছর। এ আশি বছর হযরত ইয়াকুব হযরত ইউসুফের বিচ্ছেদে ক্রন্দন করেছেন।[১০]

৩. ইবনে মাসউদ বলেছেন, 'আমরা রাসূলকে হামযা (রা.)-এর শাহাদাতের দিনের ন্যায় ক্রন্দন করতে কখনই দেখিনি।'[১১]

৪. ইবনে আবি শাইবা স্বীয় সূত্রে ইবনে মাসউদ হতে বর্ণনা করেছেন, 'একদিন আমরা রাসূলের নিকট বসেছিলাম। হঠাৎ বনী হাশিমের একদল নারী-পুরুষ সেখানে আসল। মহানবী তাদেরকে দেখামাত্রই কাঁদতে শুরু করলেন এবং তাঁর চেহারা পরিবর্তিত হয়ে গেল। সাহাবীরা প্রশ্ন করলেন : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কেন আপনার চেহারায় বিষণ্নতা লক্ষ্য করছি? তিনি বললেন : আমরা এমন এক বংশ যাদের আখেরাতকে আল্লাহ্ দুনিয়ার ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। বেশি দূরে নয়, আমার আহলে বাইতের ওপর বিপদাপদ ও নির্বাসনের দুর্যোগ নেমে আসবে।'[১২]

৫. বুখারী নিজ সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন হযরত জাফর ইবনে আবি তালিব (রা.), হযরত যাইদ ইবনে হারেসা (রা.) এবং হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ রাসূলের নিকট পৌঁছল তখন তিনি ক্রন্দন করেছিলেন।[১৩]

৬. ইবনে আসির বর্ণনা করেছেন, 'হযরত জাফর (রা.) ও তাঁর সঙ্গীদের শাহাদাতের খবর শোনার পর রাসূল (সা.) জাফরের গৃহে গেলেন ও তাঁর সন্তানদের নিজের কাছে ডাকলেন। তাদের কোলে নিয়ে মুখে চুমু খেলেন ও ক্রন্দন করলেন। জাফরের স্ত্রী আসমা তাঁকে বললেন : হে নবী! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। কেন আপনি ক্রন্দন করছেন? আপনার নিকট জাফরের কোন খবর এসেছে কি? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, সে আজ শহীদ হয়েছে।' আসমা বলেন, 'আমি গৃহের ভেতরে প্রবেশ করে মহিলাদের সাথে নিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলাম। তখন হযরত ফাতিমা (আ.) সেখানে আসলেন ও 'হে চাচা' বলে ক্রন্দন করতে লাগলেন। রাসূল (সা.) তখন বললেন, 'ক্রন্দনকারীদের উচিত জাফরের মত ব্যক্তির জন্যই ক্রন্দন করা।'[১৪]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৭. মুসলিম নিজ সূত্রে হযরত আবু হুরাইরা হতে বর্ণনা করেছেন, 'মহানবী (সা.) একদিন তাঁর মাতার কবর জিয়ারতে গেলেন এবং এতটা কাঁদলেন যে, তাঁর পাশে যাঁরা ছিলেন তাঁরাও কাঁদতে শুরু করলেন।'[১৫]

৮. হাকিম নিশাবুরী নিজ সূত্রে হযরত আয়েশা হতে বর্ণন করেছেন, মহানবী (সা.) উসমান ইবনে মাজউনের মৃত্যুর পর তাঁকে চুম্বন করেন ও ক্রন্দন করেন।[১৬]

৯. ইবনে মাজা আনাস ইবনে মালিক হতে বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) তাঁর পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুর পর আদেশ দেন তাকে না দেখার পূর্বে যেন কাফনে আবৃত করা না হয়। অতঃপর ইবরাহীমের মৃতদেহের নিকট এসে পুত্রের ওপর উপুড় হয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন।[১৭]

১০. ইবনে আব্বাস মালিকী ইমাম সাদিক (আ.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত ফাতিমা যাহরার ইন্তেকালের পর হযরত আলী (আ.) প্রতিদিন তাঁর কবর জিয়ারতে যেতেন। একদিন জিয়ারতে গিয়ে কবরের ওপর আপতিত হয়ে এ কবিতাটি পাঠ করেন :[১৮]

مالي مررت على القبور مسلما

يا قبر الحبيب فلم يرد جوابي

يا قبر ما لك لا تجيب مناديا

أمللت بعدي خلّة الاحباب

'আমার তো কখনও হয়নি এমন হে প্রিয়ার কবর!
কোন মুসলমানের কবর করেছি অতিক্রম, অথচ আমাকে দেওয়া হয়নি উত্তর,
কী হয়েছে তোমার, হে কবর! কেন দিচ্ছ না সাড়া আহ্বানকারীর আহ্বানে?
কেউ তো হবে না বন্ধুর ব্যথায় ব্যথিত, আমার পরে।'

১১. ইবনে কুতাইবা বর্ণনা করেছেন, সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে হযরত আলী (আ.) আদীকে প্রশ্ন করেন : 'আম্মার কি নিহত হয়েছেন?' তিনি বললেন : 'হ্যাঁ!' তখন আমীরুল মুমিনীন কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন : 'আল্লাহ্‌ তাঁর প্রতি রহম করুন।'[১৯]

১২. সিবতে ইবনে জাওযী বর্ণনা করেছেন, যখন মুহাম্মদ ইবনে আবি বাকরের শাহাদাতের খবর হযরত আলীর নিকট পৌঁছল তখন তিনি দুঃখ প্রকাশ করে ক্রন্দন করলেন এবং তাঁর হত্যাকারীর ওপর লানত (অভিসম্পাত) বর্ষণ করলেন।[২০]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১৩. ইয়াকুবী বর্ণনা করেছেন, হযরত খাদিজা (আ.)-এর ইন্তেকালের পর হযরত ফাতিমা (আ.) রাসূলের নিকট এসে ক্রন্দনরত অবস্থায় বলতে লাগলেন, 'আমার মা কোথায়? আমার মা কোথায়?'[২১]

১৪. ইবনে আবিল হাদীদ বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (আ.) শহীদ হওয়ার পরের দিন ভোরে ইমাম হাসান (আ.) কুফার মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণার পর হযরত আলীর পরিচয় দেওয়ার সময় শোকে তাঁর কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে পড়ে এবং তিনি কাঁদতে শুরু করেন। ফলে শ্রোতারাও হযরত আলীর শোকে কাঁদতে শুরু করেন।[২২]

১৫. কান্দুযী হানাফী হযরত আব্বাস ইবনে আলী (আ.)-এর শাহাদাতের বর্ণনায় বলেন, 'এক ব্যক্তি লৌহনির্মিত বল্লম দিয়ে তাঁর পবিত্র মস্তকে আঘাত হানলে তা দ্বিখ-িত হয়ে গেল এবং তিনি ঘোড়া হতে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং চিৎকার করে বলেন, 'হে ভ্রাতা! হে আবা আবদিল্লাহ্‌! হে হুসাইন! আপনার ওপর আমার সালাম।' ইমাম হুসাইন দ্রুত তাঁর নিকট পৌঁছলেন এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় বলতে লাগলেন : 'হে আমার ভ্রাতা, আব্বাস! আমার দেহের অংশ।' তাঁর নিকট দ-ায়মান শত্রুদের সরিয়ে দিয়ে তাঁর দেহ মাটি থেকে উঠিয়ে নিয়ে তাঁর তাঁবুর ভিতর রাখলেন। কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, 'আল্লাহ্‌ তোমাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।'[২৩]

১৬. তিনি আরও উল্লেখ করেছেন, হুর ইবনে ইয়াযীদ রিয়াহির শাহাদাতের পর উমর ইবনে সাদের সৈন্যরা তাঁর দেহ হতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে ইমাম হুসাইনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে। ইমাম হুসাইন তাঁর মাথাটি কোলে নিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং তাঁর মুখের ওপর থেকে রক্তগুলো পরিষ্কার করতে লাগলেন। অতঃপর তাঁর মস্তকের উদ্দেশে বললেন, 'তোমার মাতা তোমার নাম ভুল রাখেননি। তুমি হুর (স্বাধীন)। পৃথিবীতেও তুমি স্বাধীন ছিলে, আখেরাতেও স্বাধীন ও সৌভাগ্যবান হলে।'[২৪]

১৭. ইবনে আসাকির তাঁর সূত্রে ইমাম জাফর সাদিক (আ.) হতে বর্ণনা করেছেন যে, ইমাম সাজ্জাদ (আ.)-কে প্রশ্ন করা হলো : 'কেন আপনি ইমাম হুসাইনের জন্য এত অধিক কান্নাকাটি করেন?' তিনি জবাবে বললেন : 'আমাকে এজন্য সমালোচনা কর না। কারণ, ইয়াকুব (আ.) তাঁর এক সন্তান নিখোঁজ হওয়াতে এতটা ক্রন্দন করেন যে, তাঁর চোখ সাদা হয়ে যায়। অথচ তিনি জানতেন তাঁর সন্তান জীবিত আছেন। আর আমি আমার চোখের সামনে আমার পরিবারের চৌদ্দজন সদস্যকে জবেহ করে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হত্যা করতে দেখেছি। তোমরা কি চাও এ চরম দুঃখ-কষ্টের বিষয়টি আমার মন থেকে মুছে ফেলতে?'[২৫]

১৮. সিবতে ইবনে জাওযী বলেছেন, 'ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের পর ইবনে আব্বাস (রা.) এতটা ক্রন্দন করতেন যে, তাঁর চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।'[২৬]

১৯. ইবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেছেন, যায়েদ ইবনে আরকাম ইবনে যিয়াদের উদ্দেশে বলেন, 'তুমি তোমার লাঠিটি হুসাইনের দাঁত থেকে সরাও। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি অসংখ্যবার লক্ষ্য করেছি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) ঐ ঠোঁট দু'টিতে চুম্বন করেছেন।' এ বলে তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন।[২৭]

২০. ইবনে হাজার হাইসামী বর্ণনা করেছেন, উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালমা (রা.) ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের খবর শুনে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলেন : 'তারা এমন জঘন্য কাজ করেছে? হুসাইনকে হত্যা করার কারণে আল্লাহ্ তাদের কবরকে অগ্নিতে পূর্ণ করুন।' অতঃপর এতটা ক্রন্দন করলেন যে, অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।[২৮]

আল্লাহ্‌র ওলীদের জন্য শোকানুষ্ঠান পালনের বৈধতার বর্ণনা ও হাদীসভিত্তিক দলিল :

হাদীসগ্রন্থসমূহ এবং মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের জীবন চরিত অধ্যয়ন করলে আমরা দেখি ঐ মহান ব্যক্তিবর্গ আল্লাহ্‌র সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য শোক পালনের বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতেন ও এরূপ অনুষ্ঠান পালন করতেন।

হাকিম নিশাবুরী সহীহ সূত্রে উম্মুল ফাজল হতে বর্ণনা করেছেন, 'একদিন রাসূল (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম : হে আল্লাহ্‌র রাসূল! গতরাত্রে আমি একটি দুঃস্বপ্ন দেখেছি। রাসূল বললেন : কি স্বপ্ন? আমি বললাম : দুঃস্বপ্ন। রাসূল বললেন : তা বল। আমি বললাম : হে রাসূলাল্লাহ্! স্বপ্নে দেখলাম আপনার দেহের একটি টুকরা বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার কোলে এসে পড়েছে। নবী (সা.) বললেন : তুমি ভালো স্বপ্ন দেখেছ। আল্লাহ্ চাইলে আমার কন্যা ফাতিমা এক পুত্রসন্তান জন্মদান করবে, যে তোমার কাছে প্রতিপালিত হবে।' উম্মুল ফাজল বলেন : 'ফাতিমা (আ.) হুসাইন নামের এক পুত্রসন্তান জন্মদান করলে সে আমার কোলে প্রতিপালিত হয় যেমনটি

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রাসূল (সা.) বলেছিলেন। হুসাইন (আ.) জন্মগ্রহণ করলে আমি তাকে নিয়ে রাসূলের কোলে দিলে লক্ষ্য করলাম তিনি শিশুটিকে কোলে নিয়ে ক্রন্দন করছেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীকৃত হোক। কেন আপনি ক্রন্দন করছেন? রাসূল বললেন : জীবরাঈল (আ.) আমার কাছে এসে খবর দিলেন যে, আমার উম্মত অতি নিকটেই তাকে হত্যা করবে। আমি বললাম : এই শিশুকে? তিনি বললেন : হ্যাঁ, অতঃপর তাঁর শাহাদাতের ভূমি হতে এক টুকরা মাটি আমার হাতে দিলেন।'[২৯]

হাফেজ তাবরানী সহীহ সূত্রে শাইবান হতে বর্ণনা করেছেন, 'আমি হযরত আলীর সাথে কারবালায় প্রবেশ করলাম। তখন তিনি বললেন : এখানে এমন একদল লোক শহীদ হবে যাদের সঙ্গে বদরের শহীদগণ ব্যতীত কেউই তুলনীয় নয়।'[৩০]

তিরমিযী সহীহ সূত্রে হযরত সালমা হতে বর্ণনা করেছেন, 'একদিন উম্মে সালমার নিকট গেলে তাঁকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখলাম। তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'স্বপ্নে আল্লাহ্‌র রাসূলকে অত্যন্ত শোকাহত অবস্থায় দেখলাম। তাঁর পবিত্র মস্তক ও মুখমণ্ডল ধুলায় আবৃত ছিল। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কি হয়েছে? তিনি বললেন : এখনই হুসাইনকে শহীদ করা হয়েছে।'[৩১]

আল্লাহ্‌র ওলীদের শোকানুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া

আল্লাহ্‌র ওলীদের, বিশেষত ইমাম হুসাইনের জন্য শোক পালন শুধু জায়েযই নয়, পছন্দনীয়ও বটে, যেমনটি দীনের মহান ব্যক্তিত্বরা করতেন।

বুখারী স্বীয় সূত্রে হযরত আয়েশা হতে বর্ণনা করেছেন, যখন হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা, জাফর ইবনে আবি তালিব এবং আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের সংবাদ রাসূলের নিকট পৌঁছল তখন তিনি শোকাচ্ছন্ন হয়ে মসজিদে গিয়ে বসলেন।[৩২]

ইবনে হিশাম তাঁর সীরাত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন, যখন রাসূল (সা.) ওহুদের যুদ্ধ হতে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে শহীদদের গৃহসমূহে ক্রন্দনের রোল শুনলেন তখন মহানবীর চোখ অশ্রুসিক্ত হল এবং ক্রন্দনরত অবস্থায় বললেন, 'আফসোস হামজার জন্য কোন

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ক্রন্দনকারী নেই। এ কথা শুনে বনী আশহালের নারীরা হযরত হামজার গৃহে এসে ক্রন্দন করতে লাগলেন।[৩৩]

অনুবাদ : আবুল কাসেম

তথ্যসূত্র :

১. ইবনে তাইমিয়া, মিনহাজুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫২-৫৫
২. সূরা তাওবাহ্ : ২৪
৩. মুস্তাদরাকে হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৯৪
৪. সূরা আহ্‌যাবের ৩৩ নং আয়াত অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটে যে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।
৫. সূরা শুরা : ২৩
৬. সূরা সাফ্‌ফাত : ২৪
৭. তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃ. ১০
৮. তারীখে দামেশ্‌ক, ১২তম খণ্ড, পৃ. ১৪৩
৯. সীরাতে হালাবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩২৩
১০. তারীখে তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭
১১. প্রাগুক্ত, ১৩তম খণ্ড, পৃ. ৩২
১২. আল মুসান্নিফ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ৬৯৭
১৩. সহীহ বুখারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৪০, সাহাবীদের ফজিলতের অধ্যায়
১৪. কামিল, ইবনে আসীর, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০
১৫. সহীহ মুসলিম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৯০
১৬. মুস্তাদরাকে হাকিম, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬১
১৭. সুনানে ইবনে মাজা, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৩, কিতাবুল জানায়িয
১৮. প্রাগুক্ত
১৯. আল ইমামাহ ওয়াস সিয়াসাহ
২০. তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃ. ১০৭
২১. তারীখে ইয়াকুবী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৫

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

২২. ইয়ানাবিউল মাওয়াদ্দাহ, পৃ. ৪০৯

২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৯

২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৪

২৫. তারীখে দামেশ্‌ক, ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) জীবনী অধ্যায়, পৃ. ৫৬

২৬. তাযকিরাতুল খাওয়াস, পৃ. ১৫২

২৭. উসদুল গাবাহ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২১

২৮. সাওয়ায়েকে মুহরিকা, পৃ. ১৯৬

২৯. মুস্তাদরাকে হাকিম, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৭৬; কানজুল উম্মাল, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ২২৩

৩০. মাকতালে খারেজমী, পৃ. ১৬২

৩১. মুস্তাদরাক আল সাহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৯

৩২. ইরশাদুস সারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৯৩

৩৩. আস সীরাতুন নাবাভী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৫

(প্রবন্ধটি ইসলামী সেবাদপ্তর, কোম, ইরান থেকে প্রকাশিত ‘ওয়াহাবীদের সৃষ্ট সংশয়ের অপনোদন’ গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হযরত আলী (আ.)-এর জীবনের স্মরণীয় কিছু বিষয়

আল্লামা সাইয়্যেদ মোর্তজা আসকারী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ওহুদের যুদ্ধ

তৃতীয় হিজরির শাওয়াল মাসে তিন হাজার কুরাইশ যোদ্ধা মদীনার নিকটবর্তী ওহুদ প্রান্তে বদর যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সমবেত হয়। মহানবী (সা.) এক হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা থেকে বের হয়ে ওহুদে পৌঁছলেন। দুই দল মুখোমুখি হলে তিনি শ্রেষ্ঠ বীর হযরত আলীর হাতে ইসলামের পতাকা দিলেন। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ যোদ্ধার হাতে দলীয় পতাকা দেয়া হত এবং এরূপ বীরদের শ্রেষ্ঠত্বের ধারাবাহিকতা অনুসারে একে একে পতাকা ধারণ করত। ওহুদের যুদ্ধে নয় জন কুরাইশ যোদ্ধা একের পর পতাকা ধারণ করেছিল। তাদের সকলেই হযরত আলী (আ.)-এর তরবারির আঘাতে নিহত হয়েছিল। তাদের মৃত্যুর পর কুরাইশরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করছিল, কিন্তু মুসলমানরা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করে গণিমত (কাফেরদের ফেলে যাওয়া মালামাল) সংগ্রহে মগ্ন হলে পেছন থেকে মুশরিকদের এক দল তাদের আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করে।

খন্দকের যুদ্ধ

পঞ্চম হিজরির জিলকদ মাসে মক্কার মুশরিকরা দশ হাজার সৈন্য নিয়ে মদীনা আক্রমণের পরিকল্পনা করে। মুসলমানরা হযরত সালমান ফারসির পরামর্শে বিশাল

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এক পরিখা খনন করে যাতে মুশরিক সেনাদল মদীনায় প্রবেশ করতে না পারে। আমর ইবনে আবদে উদ নামের আরবের এক প্রসিদ্ধ বীর তার ঘোড়া নিয়ে পরিখা অতিক্রম করে মুসলমানদের সামনে এসে মল্লযুদ্ধের আহ্বান জানাল। মুসলমানরা তার বিশাল দেহ ও রণমূর্তি দেখে তার মুখোমুখি হওয়ার সাহস করছিল না। সে তাদের আহ্বান করে বলছিল, 'তোমরা তো বিশ্বাস কর যে, তোমাদের কেউ নিহত হলে বেহেশতে যাবে তাহলে কেন অগ্রসর হচ্ছ না?' তখন মহানবী (সা.) সাহাবীদের আহ্বান করে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত আছ?' হযরত আলী (আ.) বললেন, 'আমি।' তখন তিনি তাঁর পাগড়ি খুলে আলী (আ.)-এর মাথায় বেঁধে দিলেন। আলী আমরের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে তিনটি প্রস্তাব দিচ্ছি, এর মধ্যে যে কোন একটি মেনে নাও : এক. ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যাও; দুই. যে সৈন্যদলসহ এসেছ তা নিয়ে ফিরে যাও; তিন. যেহেতু আমার ঘোড়া নেই তাই যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়া থেকে নেমে আস।' সে বলল, 'আমি তোমার তৃতীয় প্রস্তাব মেনে নিচ্ছি।' অতঃপর সে ঘোড়া থেকে নেমে আসল।

উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে সে তরবারি দিয়ে হযরত আলীর ওপর আঘাত হানল। তিনি ঢাল দিয়ে তা আটকানোর চেষ্টা করলে তা দ্বিখণ্ডিত হয়ে তাঁর মাথায় আঘাত হানল (ঐ স্থানেই পরবর্তীকালে ইবনে মুলজিমের তরবারির আঘাত লেগেছিল এবং তিনি তাতে শহীদ হয়েছিলেন)। তিনি রক্তাক্ত অবস্থায়ই তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকলেন। সুযোগ বুঝে তিনি আমরের পায়ে তরবারি দিয়ে আঘাত হানলে তার পা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং তিনি আরেকটি আঘাত করে তাকে মাটিতে ফেলে দিলেন। অতঃপর তাকে হত্যা করলেন।

যদিও তখন যুদ্ধের রীতি ছিল হত্যাকারী নিহত ব্যক্তির পোশাক ও অস্ত্রাদির অধিকারী হবে, কিন্তু হযরত আলী আবদে উদের দেহ থেকে বর্ম ও পোশাক না খুলেই চলে এলেন। হযরত ওমর তাঁকে বললেন, 'তার বর্মটির মূল্য একশ দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) বা এক হাজার দিরহাম (রৌপ্য মুদ্রা) হবে। তবুও কেন তা গ্রহণ করলেন না।' তিনি বললেন, 'আমি চাইনি তাকে নগ্নদেহে ফেলে রাখতে।' এ খবর যখন আমরের বোনের নিকট পৌঁছল তখন সে বলল, 'যদি তাকে সে নগ্ন করত তবে মৃত্যু পর্যন্ত তার জন্য আমি ক্রন্দন করতাম। কিন্তু যে তাকে হত্যা করেছে সে মহৎ ছিল। তাই তার জন্য আমি ক্রন্দন করব না।'[১]

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

খায়বরের যুদ্ধ

মদীনার ইহুদীরা খুবই সম্পদশালী ছিল। তারা মহানবী (সা.)-কে অত্যন্ত কষ্ট দিত। মহানবী (সা.) তাদের এক গোত্র বনি নাযিরকে দমনের জন্য তাদের আবাসস্থল খায়বরের দিকে যাত্রা করলেন। সেখানে তাদের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। দীর্ঘদিন তিনি তাদের অবরোধ করে রাখলেন, কিন্তু তা ফলপ্রসূ হল না। তিনদিন পরপর তাদের সঙ্গে মুসলমানদের মুখোমুখি যুদ্ধ হয়। প্রথমদিন রাসূল (সা.) হযরত আবু বকরকে একদল সেনাসহ তাদের উদ্দেশে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদের আক্রমণ করে পরাস্ত হয়ে ফিরে এলেন। মহানবী (সা.)-এর নিকট ফিরে এসে তিনি তাঁর সৈন্যদের বিরুদ্ধে কাপুরুষতার অভিযোগ আনলেন। সৈন্যরাও উল্টো তাঁকে ভীরু বলে অভিযুক্ত করল।[২]

দ্বিতীয় দিন তিনি হযরত ওমরকে সেনাদলসহ যুদ্ধে প্রেরণ করলেন। তিনিও ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসলেন। তাঁর বিরুদ্ধেও সৈন্যরা ভীরুতার অভিযোগ আনল।[৩]

তৃতীয় দিনের আগের রাতে রাসূল (সা.) বললেন, 'আগামীকাল এমন এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করব যে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালবাসে। সে প্রচ- আক্রমণকারী, পলায়নকারী নয়।' সকল সাহাবী আকাঙ্ক্ষা করতে লাগলেন ঐ ব্যক্তি যেন তিনি হন। তৃতীয় দিন সকালে রাসূল (সা.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'আলী কোথায়?' সকলে বললেন, 'তিনি চোখের ব্যথায় আক্রান্ত ও পীড়িত।' মহানবী (সা.) বললেন, 'তাকে আন।' হযরত আলীকে আনা হলে তিনি তাঁর মুখের লালা তাঁর চোখে লাগিয়ে দিলেন। আলী আরোগ্য লাভ করলেন। হযরত আলী বলেন, 'এরপর কখনও আমি চোখের ব্যথায় আক্রান্ত হইনি।'

রাসূল (সা.) যুদ্ধের পতাকা হযরত আলীর হাতে দিলেন এবং সৈন্যদের নিয়ে যাত্রা করতে বললেন। ইহুদীদের প্রসিদ্ধ বীর মারহাবের রণমূর্তিই মূলত পূর্ববর্তী সেনাদলের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করেছিল। হযরত আলী ইহুদীদের দুর্গের নিকট পৌঁছলে মারহাব তাঁর সাথে মোকাবিলার জন্য বেরিয়ে আসল। যুদ্ধ শুরু হল এবং বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর হযরত আলী তার ওপর বিজয়ী হলেন ও তাকে হত্যা করলেন। অতঃপর দুর্গের দরজা উপড়ে ফেললেন এবং তা ইহুদীদের খননকৃত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিখার ওপর স্থাপন করলেন। এভাবে মুসলিম সৈন্যরা দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করে তা দখল করল।

হযরত আলী মহানবী (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত

রাসূল (সা.) মদীনার নিকটে সংঘটিত সকল যুদ্ধে হযরত আলীকে সঙ্গে নিতেন এবং মদীনায় কাউকে না কাউকে অস্থায়ীভাবে স্থলাভিষিক্ত হিসাবে রেখে যেতেন। যেমন তিনি একবার অন্ধ সাহাবী ইবনে মাকতুমকে এবং আরেকবার সাহাবী আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদকে মদীনায় দায়িত্ব দিয়ে যান। সাধারণত এ ধরনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে খুব অল্প সময়ের জন্য দায়িত্ব পালন করতে হত।

তাবুকের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.)-কে কিছুটা দীর্ঘ সময়ের জন্য মদীনা ত্যাগ করতে হয়েছিল। তাবুক মদীনা হতে নয়শ' কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং তিনি দুই মাসের অধিক সময়ের জন্য মদীনা ত্যাগ করছিলেন। এ অবস্থায় কখনই কাঙ্ক্ষিত ছিল না ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রকে তিনি অরক্ষিত রেখে যাবেন কিংবা সাধারণ কোন ব্যক্তির হাতে তার দায়িত্ব অর্পণ করবেন। তাই এ যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে তিনি আলী (আ.)-কে কেন্দ্রের সার্বিক দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত করলেন। মুনাফিকরা বলা শুরু করল, 'রাসূল (সা.) তাঁর চাচাত ভাইয়ের প্রতি বিরক্ত হয়েছেন (তাই তাকে সঙ্গে নেননি)।' এ কথা শুনে হযরত আলী (আ.) রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে মদীনার বাইরে রাসূল (সা.)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ্র রাসূল! মুনাফিকরা বলাবলি করছে, আপনি আমার প্রতি বিরক্ত হয়ে আমাকে মদীনায় ছেড়ে যাচ্ছেন। আমাকে আপনার সঙ্গে যাওয়ার অনুমতি দিন।' রাসূল (সা.) বললেন, 'হে আলী! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তোমার মর্যাদা আমার কাছে মূসার কাছে হারুনের মর্যাদার ন্যায় হোক। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, আমার পর কোন নবী নেই।'[৪]

কুরআন ও আলী (আ.)

মহানবী (সা.) হযরত আলীকে সমগ্র কুরআনের তাফসীর শিক্ষা দিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক প্রমাণসমূহ এ সাক্ষ্য দান করে যে, রাসূল (সা.) তাঁর পরে হযরত

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আলীকে ইসলামের প্রচারের পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করছিলেন। আমি (লেখক) আমার 'মায়ালিমুল মাদরাসাতাইন' গ্রন্থে তাবাকাতে ইবনে সাদ, সুনানে ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য গ্রন্থ থেকে অসংখ্য হাদীস এ মর্মে উদ্ধৃত করেছি যে, মহানবী (সা.) প্রতি রাতে আলী (আ.)-এর সঙ্গে বিশেষ বৈঠক করতেন (তাঁকে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে)। হযরত আলী রাসূলের গৃহের দরজায় দাঁড়িয়ে 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনাকে সালাম' বলে অনুমতি চাইতেন। রাসূল (সা.) অনুমতি দিলে তিনি গৃহে প্রবেশ করতেন। তখন রাসূল (সা.) তাঁর ওপর অবতীর্ণ আয়াতসমূহ আলীর জন্য পাঠ করতেন এবং ব্যাখ্যা দান করতেন। অতঃপর বলতেন, 'হে আলী, লিখে রাখ।' হযরত আলী কখনও কখনও বলতেন, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আপনি আমার ভুলে যাওয়ার আশংকা করছেন?' তিনি বলতেন, 'না। কারণ, আমি আল্লাহ্‌র নিকট দোয়া করেছি যেন তুমি কখনও ভুলে না যাও; বরং তুমি আমার ও তোমার অংশীদারদের (বংশধর) জন্য লিখে রাখ।' যদি সে বৈঠকে ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন উপস্থিত থাকতেন তবে বলতেন, 'এদের জন্য ও হুসাইনের বংশের ইমামদের জন্য লিখে রাখ।' নবী বংশের পবিত্র ইমামদের নিকট এ গ্রন্থটি ছিল।

সে যুগে কোন লেখা স্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করার জন্য পশুর শুষ্ক চামড়ার ওপর লেখা হত। হযরত আলী উটের শুষ্ক ও পাকা চামড়ার ওপর পবিত্র কুরআন সংকলিত করেছিলেন। তাঁর সংকলিত ব্যাখ্যা সম্বলিত কুরআন সত্তর হাত দীর্ঘ চর্মপত্রে লিপিবদ্ধ ছিল। আমি আমার তিন খণ্ডে রচিত 'আল কুরআনুল কারিম' গ্রন্থে রাসূল (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ দু'ধরনের ওহীর প্রতি ইশারা করেছি। এ দু'ধরনের ওহী হল : কুরআনী ওহী ও বর্ণনা বা ব্যাখ্যামূলক ওহী। কুরআনী ওহী হল যা কুরআনের মূল অংশ হিসাবে মুজিযাস্বরূপ, কেউ তার অনুরূপ আনতে পারবে না এরূপ চ্যালেঞ্জসহ তাঁর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যার মধ্যে বিন্দুমাত্র কম-বেশি হওয়ার অবকাশ নেই। কিন্তু রাসূল (সা.)-এর নিকট শুধু কুরআনী ওহীই আসত না; বরং তাঁর ওপর যখন কোন আয়াত অবতীর্ণ হত তখন জিবরীল (আ.) ঐ আয়াতের ব্যাখ্যাও তাঁর জন্য নিয়ে আসতেন। যেমন পবিত্র কুরআনে নামাযের রাকায়াত সংখ্যা বর্ণিত হয়নি। শুধু বলা হয়েছে : «اقم الصلوة لدلوك الشمس الى غسق الليل» 'তুমি সূর্য হেলে যাওয়ার পর হতে রাতের ঘোর অন্ধকার পর্যন্ত নামায প্রতিষ্ঠা কর।'[৫] হযরত জিবরীল (আ.) এ আয়াত বর্ণনা করেই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি; বরং তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে প্রতিটি নামাযের রাকায়াত সংখ্যা ও তা কীভাবে পড়তে হবে তা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

রাসূলের উদ্দেশে বর্ণনা করেছেন। কুরআন বহির্ভূত কিন্তু কুরআনের ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট যে অংশ ওহীরূপে জিবরীল (আ.) নিয়ে আসতেন তা হল বর্ণনা বা ব্যাখ্যামূলক ওহী।

যে ধরনের ওহীই আসত মহানবী (সা.) তা লিখে রাখার জন্য ওহী লেখকদের ডেকে পাঠাতেন এবং আয়াতসমূহকে তিনি ব্যাখ্যাসহ লেখার নির্দেশ দিতেন। ওহী লেখকরাও তৎকালে প্রচলিত বিভিন্ন লিখন সামগ্রীতে, যেমন তক্তা, পশুর হাড়, চামড়ায় তা লিখে রাখতেন।

রাসূল (সা.) যেরূপে আয়াতসমূহ ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা করতেন, তাঁরাও সেরূপে ব্যাখ্যাসহ তা লিপিবদ্ধ করতেন। সুতরাং রাসূল (সা.)-এর সময় সংকলিত কোন কুরআনই তাঁর পবিত্র মুখনিঃসৃত বর্ণনামূলক ওহী ব্যতীত লিপিবদ্ধ ছিল না। কিন্তু যেহেতু তাঁর এ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা বিশেষ গোষ্ঠীর রাজনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী ছিল তারা সেগুলোসহ কুরআন সংকলনের বিরোধী ছিল। যেমন : পবিত্র কুরআনে বর্ণিত– والشجرة الملعونة في القرآن 'এবং ঐ বৃক্ষ যাকে কুরআনে অভিশপ্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে'[৬]– অভিশপ্ত বৃক্ষ যে বনি উমাইয়্যা তা কুরআনের এ আয়াতের সাথে উল্লিখিত থাকলে বনি উমাইয়্যার ক্ষমতা লাভের বিষয়টি অবৈধ প্রমাণিত হত। তাই তারা এর বিরুদ্ধে ছিল এবং তা সংকলিত হতে দেয়নি। কিন্তু কুরআন তার ব্যাখ্যাসহ রাসূলের পবিত্র আহলে বাইতের নিকট ছিল। সাহাবীরাও কম-বেশি কুরআনের সূরা ও আয়াতসমূহ ব্যাখ্যাসহ লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সাহাবীদের সংকলিত কুরআনের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হত তা এ ব্যাখ্যার (বর্ণনামূলক ওহীর) বিদ্যমানতা ও অবিদ্যমানতার কারণে ছিল, মূল কুরআনে কম বা বেশি হওয়ার কারণে কখনই ছিল না।

কুরআনের মূল আয়াত মহানবী (সা.)-এর ব্যাখ্যা ব্যতীত কখনই বোধগম্য নয়। তাই স্বয়ং আল্লাহ্ই তাঁকে মানুষের জন্য তা ব্যাখ্যা করতে বলেছেন।[৭] কিন্তু কুরাইশদের একাংশের জন্য ঐ ব্যাখ্যা বিপজ্জনক ছিল বলে তারা এ কাজে বাধা দিয়েছে। মুসনাদে আহমাদ এবং সুনানে ইবনে মাজাতে আবদুল্লাহ্ ইবনে আমর ইবনে আস থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'আমি রাসূল (সা.) থেকে যা শুনতাম তা-ই লিপিবদ্ধ করতাম, কিন্তু কুরাইশরা (এর একাংশ) আমাকে বলল, তুমি কি আল্লাহ্র রাসূল (সা.) থেকে যা শোন, তা-ই লেখ, অথচ তিনি মানুষ হিসাবে কখনও রাগান্বিত হন (তখন কারও

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

প্রতি অসন্তুষ্ট হন) এবং কখনও আনন্দিত হন (তখন কারও প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন)। তাদের কথায় আমি (তাঁর বাণী) লিপিবদ্ধ করা হতে বিরত হলাম। পরে বিষয়টি আল্লাহ্‌র রাসূলকে বললাম। তিনি বললেন, লেখ। (কারণ) আমার মুখ থেকে সত্য ব্যতীত কিছুই বের হয় না।'[৮]

পবিত্র কুরআনের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা হযরত আলী (আ.)-এর নিকট ছিল এবং রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর তিনি তাঁর পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী তা পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে বিন্যস্ত করেন। যদিও তাঁর সংকলিত কুরআন কুরাইশরা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিল, 'আমাদের নিকট (ব্যাখ্যাহীন) যে কুরআন রয়েছে তা-ই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' অথচ তাদের সংকলিত সে কুরআনে জিবরীল (আ.) কর্তৃক আনীত ব্যাখ্যা বিদ্যমান ছিল না (যদিও কুরআন বোঝার জন্য তা আবশ্যক ছিল)। হযরত আলী (আ.) কুরাইশদের উদ্দেশে বলেন, 'এরপর, তোমরা (রাসূলের ব্যাখ্যা সম্বলিত) এ কুরআন আর দেখবে না।' তিনি সেটিকে ইমাম হাসান ও হুসাইনের নিকট হস্তান্তর করেন। ইমাম হুসাইন (আ.) কারবালার উদ্দেশে যাত্রার পূর্বে তা উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামার নিকট গচ্ছিত রাখেন এবং অসিয়ত করেন তাঁর শাহাদাতের পর সেটি তাঁর পুত্র আলী ইবনুল হুসাইনকে দেওয়ার। এভাবে তা পরবর্তী ইমামদের হাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। পরবর্তী ইমামগণ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের ব্যাখ্যা এ গ্রন্থ থেকেই করতেন এবং কখনও নিজেদের প্রবৃত্তির বশে মনগড়া কিছু বলতেন না। কারণ, তাঁরা নিজেরাই বলতেন, 'যদি কেউ কুরআনের বিষয়ে মনগড়া কিছু বলে তবে সে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।' সুতরাং কুরআনের ক্ষেত্রে তাঁরা সকলেই মহানবী (সা.)-এর ব্যাখ্যার ওপর নির্ভর করতেন যেটি স্বয়ং আলী (আ.) তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী থেকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এ যুক্তিতে তাঁরাও হযরত আলী (আ.)-এর ন্যায় পবিত্র কুরআনের পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

হযরত আলী ও গাদীরে খুম

রাসূল (সা.) তাঁর সমগ্র জীবনে আলীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসাবে প্রস্তুত করার কাজে রত ছিলেন। তাঁর জীবনের শেষ হজ্ব সম্পাদনের পর তাঁর স্বহস্তে প্রশিক্ষিত এ শিষ্যকে তিনি মহান আল্লাহ্‌র নির্দেশে (সূরা মায়েদা : ৬৭) 'গাদীরে খুম' নামক স্থানে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

স্বীয় স্থলাভিষিক্ত হিসাবে ঘোষণা করেন। যদিও রাসূল (সা.) তাঁর নবুওয়াতী জীবনের বিভিন্ন সময় মুসলমানদের বিভিন্ন ব্যক্তি ও দলের সামনে আলীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার বিষয়টি উত্থাপন করেছেন, এমনকি তাঁর বংশের বার জন ইমাম ও প্রতিনিধির নামও অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুসলমানদের বিশাল কোন সমাবেশে এ ঘোষণা তিনি ইতোপূর্বে দেননি। (যেহেতু স্থলাভিষিক্তের বিষয়টি নবুওয়াতী মিশনের পূর্ণতার জন্য অপরিহার্য ছিল সেহেতু তিনি চেয়েছেন ইসলামী ভূখণ্ডের সকল প্রান্ত থেকে মুসলমানরা এ সমাবেশে আসুক। মহানবী (সা.) এ উদ্দেশ্যে এ হজ্বে আসার পূর্বেই সকলকে এতে যোগদান করার জন্য বিভিন্ন স্থানে বার্তা পাঠিয়েছিলেন। এ হজ্বে কমপক্ষে সত্তর হাজার মুসলমান অংশগ্রহণ করেছিলেন)।

মহানবী (সা.) যখন আরাফার মহাসমাবেশে বক্তব্য দানের জন্য উঠলেন তখন হযরত জিবরীল (আ.) অবতীর্ণ হয়ে হযরত আলীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ঘোষণার নির্দেশ নিয়ে আসলেন। কিন্তু রাসূল (সা.) পরিস্থিতি বিবেচনা করে তা ঘোষণা হতে বিরত থাকলেন। তিনি এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন যে, কুরাইশ ও অন্য আরবরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনবে : তিনিও আরব গোত্রপতিদের মত (স্বীয় পুত্রের অনুপস্থিতিতে) নিজের চাচাত ভাইকে স্থলাভিষিক্ত প্রতিনিধি হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তাই তিনি যথাযথ সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অতঃপর হজ্বের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়ে গেলে সকল হাজী স্ব স্ব দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা শুরু করলেন। রাসূল (সা.)ও তাঁদের সঙ্গে যাত্রা করে 'জোহফা' নামক স্থানে পৌঁছলেন যেখান থেকে ইয়েমেন, সিরিয়া ও মদীনার পথ পৃথক হয়ে যায়। ঠিক সে সময় পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ হয় : 'হে রাসূল! তোমার ওপর তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার করে দাও; যদি তুমি তা না কর, তবে তোমার রেসালাতের দায়িত্বই পালন করলে না।'[৯]

রাসূল (সা.) অনতিবিলম্বে সকলকে যাত্রা বিরতি করার নির্দেশ দিলেন। তিনি নিজের জন্য তাঁবু খাটালেন এবং অন্যদেরকে তাঁবু স্থাপনের আদেশ দিলেন। সে সাথে বললেন, 'যারা আগে চলে গিয়েছে তাদের ফিরে আসতে বল এবং যারা এখনও এসে পৌঁছায়নি তাদের জন্য অপেক্ষা কর।' অতঃপর গাদীরে খুমে সকলকে নিয়ে যোহরের নামায পড়লেন। নামাযান্তে উটের ওপর বসার আসনগুলো দিয়ে উঁচু করে এক মঞ্চ তৈরি করা হল। তিনি তাতে আরোহণ করে বললেন, 'আমি কি মুমিনদের ওপর

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাদের নিজেদের থেকেও অগ্রাধিকার রাখি না?' সকলে উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি হযরত আলী (আ.)-এর হাত এতটা উঁচু করে ধরলেন যে, তাঁদের উভয়ের শুভ্র বগল দেখা যাচ্ছিল। এরপর তিনি বললেন, 'আমি যার মাওলা, এ আলীও তার মাওলা (অভিভাবক)। হে আল্লাহ্! যে তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে, তুমিও তাকে বন্ধু হিসাবে গ্রহণ কর এবং যে তার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করে, তুমিও তাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ কর এবং যে তাকে সাহায্য করে, তুমিও তাকে সাহায্য কর, আর যে তাকে পরিত্যাগ করে, তুমিও তাকে পরিত্যাগ কর।'[১০]

মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) তখন বললেন, 'আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি মূল্যবান ও ভারী বস্তু রেখে যাচ্ছি : আল্লাহ্র কিতাব ও আমার আহলে বাইত। যদি তোমরা এ দু'টিকে আঁকড়ে ধর, তাহলে আমার পর বিচ্যুত হবে না। নিশ্চয়ই সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞাত (আল্লাহ্) আমাকে জানিয়েছেন যে, এ দু'টি হাউজে কাউসারে আমার সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত একে অপর থেকে পৃথক হবে না।'[১১]

রাসূল (সা.) সাধারণত আনুষ্ঠানিকভাবে কোন সভা আয়োজিত হলে তাতে বিশেষ পাগড়ি পড়তেন যার নাম ছিল 'সাহাব'। তিনি গাদীরের সমাবেশে তাঁর এ বিশেষ পাগড়ি আলী (আ.)-এর মাথায় পরিয়ে দিলেন। তখন উপস্থিত সকলে হযরত আলীকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করলেন। হযরত আবু বকর ও হযরত ওমরও তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। হযরত ওমর তাঁকে উদ্দেশ করে বললেন, 'হে আবু তালিবের সন্তান! তুমি এখন থেকে সকল মুমিন নর ও নারীর নেতা ও অভিভাবক হয়ে গেলে।'[১২]

(সমাপ্ত)

অনুবাদ : আবুল কাসেম

তথ্যসূত্র

১. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২০; বিহারুল আনওয়ার, ২১তম খণ্ড, পৃ. ২০৭
২. তারীখে তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩০০

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

৩. প্রাগুক্ত

৪. সীরাতে ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫২০

৫. সূরা বনি ইসরাঈল : ৭৮

৬. প্রাগুক্ত : ৬০

৭. সূরা নাহল : ৪৪

৮. মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৬২; আল মাকতাবুল ইসলামী প্রকাশনা, বৈরুত, প্রকাশকাল ১৩৮৯ হিজরি

৯. সূরা মায়েদা : ৬৭

১০. সহীহ তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, ২০তম অধ্যায় (বাবু মানাকিবি আলী ইবনে আবি তালিব), পৃ. ৬৩৩, হাদীস নং ৩৭১৩; সহীহ ইবনে মাজা, ১ম খণ্ড, বাবু ফাজায়িলি আলী ইবনে আবি তালিব, পৃ. ৪৩, হাদীস নং ১১৬ এবং পৃ. ৪৫, হাদীস নং ১২১; মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৩৭২ ও ২৮১; মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯-১১০; খাসায়িস, নাসায়ী, পৃ. ২২ ও ১২২; আননিহায়া ফি গারিবিল হাদীস, ইবনে আসীর, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৮; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবনে কাসীর, ১২তম খণ্ড, পৃ. ২১৯; সাওয়ায়েকে মুহরিকা, ৯ম অধ্যায়, হাদীস নং ৪, পৃ. ১২২; তারিখুল কাবীর; বুখারী, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫

১১. মুসনাদে আহমাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১৪ ও ১৮ (আবু সাঈদ খুদরী সূত্রে বর্ণিত); সুনানে তিরমিযী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৩২৯, হাদীস নং ৮৩৭৬; মুসতাদরাক, ৩য় খণ্ড, পৃ. ১০৯ ও ১৪৮, ফাজায়িলুস সাহাবা, পৃ. ৩৭৪, মুজামুল আওসাত, তাবরানী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৪; মুজামুল কাবীর, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৬৬ ও ১৬৯

১২. মুসনাদে আহমাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৮১; তারীখে ইসলাম, যাহাবী, পৃ. ৬৩৩; আননিহায়া ফি গারিবিল হাদীস, ইবনে আসির, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২২৮; তারিখে বাগদাদ, ৮ম খণ্ড, পৃ. ২৯০; আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩৮৬

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কারবালার ইতিহাস ও 'বিষাদ সিন্ধু'র কাহিনী

মো. আশিফুর রহমান

বিষাদ সিন্ধু–কথা সাহিত্যিক মীর মশার্‌রফ হোসেনের বিখ্যাত উপন্যাস। মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর দৌহিত্র ও বেহেশতের যুবকদের নেতা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর হৃদয়বিদারক শাহাদাতের ঘটনা এর প্রধান উপজীব্য।

এ উপন্যাস রচিত হয়েছে উপক্রমণিকা, মহররম পর্ব, উদ্ধারপর্ব, এজিদবধ পর্ব ও উপসংহার সহকারে। প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

উপক্রমণিকা : উপক্রমণিকায় মহানবী (সা.) কর্তৃক তাঁর দুই নাতি ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের (হোসেনের) শাহাদাতের সংবাদ দেওয়ার ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। যখন তিনি এ দুঃসংবাদ তাঁর সাহাবীদের সম্মুখে দেন তখন সাহাবীরা জানতে চান যে, কে এ হত্যাকা- ঘটাবে। মহানবী (সা.) মু'আবিয়ার (মাবিয়ার) পুত্র ইয়াযীদের (এজিদের) নাম উল্লেখ করেন। যেহেতু মু'আবিয়া তখনও বিয়ে করেননি, তাই তিনি এ খবর শোনার পর বিয়ে না করার শপথ করেন। কিন্তু মহানবী বলেন, তাঁর এমন শপথ করা উচিত নয়। পরে মু'আবিয়া এক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে এ ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের জন্য মহানবী (সা.) তাঁকে বিয়ে করার পরামর্শ দেন। যেন কোন সন্তানের জন্ম না হয় সেজন্য মু'আবিয়া এক বৃদ্ধাকে বিয়ে করেন। কিন্তু এ বৃদ্ধার গর্ভেই ইয়াযীদের জন্ম হয়। মু'আবিয়া ইয়াযীদকে ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের নিকট থেকে দূরে রাখার জন্য দামেশকে চলে যান। সময়ের পরিক্রমায় মহানবী (সা.), হযরত ফাতেমা, হযরত আলী ইন্তেকাল করেন। ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন মদীনায় বয়ঃপ্রাপ্ত হন। অন্যদিকে ইয়াযীদ দামেশকে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এরপর থেকেই মহররম পর্ব, উদ্ধার পর্ব ও এজিদ বধ পর্ব এ তিন পর্বে উপন্যাসের মূল ঘটনা উপস্থাপন করা হয়েছে। নিচে সংক্ষেপে এ তিনটি পর্ব সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হল।

মহররম পর্ব : এ পর্বের বিষয়বস্তু হল ইমাম হাসানের সাথে ইয়াযীদের বিরোধ, ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা ও কারবালায় ইমাম হুসাইনকে হত্যা। বিষয়গুলো নিম্নরূপ :

আবদুল জব্বারের স্ত্রীর নাম জয়নাব। খুবই রূপবতী। মু'আবিয়ার পুত্র ইয়াযীদ তাকে দেখে মুগ্ধ হয় এবং তাকে বিয়ে করতে চায়। ইয়াযীদের মা মারওয়ানের সাথে পরামর্শ করে এবং প্রলোভন দেখিয়ে জয়নাবের সাথে আবদুল জব্বারের বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করে। আবদুল জব্বার জয়নাবকে তালাক দেয়। এরপর ইয়াযীদ জয়নাবের কাছে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে দূত প্রেরণ করে। পথিমধ্যে এ দূতের সাথে ইমাম হাসানের সাক্ষাৎ হয়। ইমাম হাসান জয়নাবের কাছে তাঁর পক্ষ থেকেও বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার জন্য দূতকে অনুরোধ করেন। জয়নাব ইয়াযীদের প্রস্তাব প্রত্যাখান করে এবং ইমাম হাসানের প্রস্তাব গ্রহণ করে। ইমাম হাসান জয়নাবকে বিয়ে করেন। ইয়াযীদ ক্রোধে ফেটে পড়ে। অন্যদিকে ইমাম হাসানের অপর স্ত্রী জায়েদা জয়নাবকে হিংসা করতে শুরু করে।

ইতিমধ্যে মু'আবিয়া অসুস্থ হয়ে মারা যান। ইয়াযীদ বাদশাহ হয়। সে মদীনার অধিবাসীদের তার আনুগত্য স্বীকার করার নির্দেশ দেয়। মদীনার অধিবাসীরা তা অস্বীকার করলে ইয়াযীদ মারওয়ানকে মদীনা আক্রমণের জন্য প্রেরণ করে। মদীনার সেনাদলের সাথে মারওয়ানের সেনাদলের যুদ্ধ হয় এবং মারওয়ান পরাজিত হয়। পরে মারওয়ান মায়মুনা নামের এক বৃদ্ধার সাথে ইমাম হাসানকে হত্যার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করে। মায়মুনা ইমাম হাসানের স্ত্রী জায়েদার মাধ্যমে বিষ প্রয়োগে ইমাম হাসানকে হত্যা করে। ইমাম হুসাইন এ হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন।

এদিকে কুফার শাসক উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ (আবদুল্লাহ জেয়াদ) ধোঁকা দিয়ে ইমাম হুসাইনকে বন্দী করার জন্য বাহ্যিকভাবে ইমাম হুসাইনকে নেতা বলে স্বীকার করে এবং তাঁকে কুফায় আসার আহ্বান জানিয়ে পত্র প্রেরণ করে। ইমাম হুসাইন কুফার অবস্থা যাচাইয়ের জন্য মুসলিম ইবনে আকীলকে প্রেরণ করেন। মুসলিম

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

কুফার ব্যাপারে ইতিবাচক পত্র প্রেরণের পর ইমাম ছয় হাজার সৈন্য নিয়ে কুফার দিকে রওয়ানা হন। পথে তিনি মুসলিমের শাহাদাতের খবর পান। মুহররম মাসের আট তারিখে ইমাম হুসাইন কারবালার প্রান্তরে পৌঁছেন। এখানে ইয়াযীদের সেনাবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হন। তারা ফোরাত নদীর পানি বন্ধ করে দেয়। ইমামের পরিবার ও সাথীরা ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েন। এ অবস্থার মধ্যেও ইমাম হুসাইন তাঁর মেয়ে সাকীনার সাথে ইমাম হাসানের ছেলে কাসেমের বিয়ে দেন। অবশেষে মুহররমের দশ তারিখে ইয়াযীদের সেনাদলের সাথে যুদ্ধ করতে করতে ইমাম হুসাইন তাঁর সকল সঙ্গী-সাথীসহ শাহাদাত বরণ করেন।

উদ্ধার পর্ব : এ পর্বের বিষয়বস্তু হল ইমাম হুসাইনের পরিবারের বন্দী হওয়া, ইয়াযীদের দরবারে ইমাম হুসাইনের পবিত্র মাথা নিয়ে যাওয়া এবং এর অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়ার (মোহাম্মদ হানিফার) দামেশক আক্রমণ ও ইমাম যায়নুল আবেদীনের বন্দীদশা থেকে পালিয়ে যাওয়া। যা সংক্ষেপে নিম্নে বর্ণিত হল।

কারবালার হত্যাকা-ের পর নবী শিমার পরিবারের তাঁবুতে ইয়াযীদের সৈন্যরা আক্রমণ করে। মারওয়ান নবী পরিবারের সদস্যদের বন্দী করতে এলে ইমাম হুসাইনের মেয়ে সাকীনা আত্মহত্যা করেন। অন্যদিকে শিমার পুরস্কারের লোভে ইমাম হুসাইনের কাটা মাথা নিয়ে দামেশকের দিকে রওয়ানা হয়। পথিমধ্যে রাত হলে সে আজর নামের এক ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নেয়। আজর সীমারের নিকট থেকে নিহত ব্যক্তির পরিচয় জানতে পেরে তাকে পরামর্শ দেয় যেন সে তা তার হেফাজতে রাখে যাতে রাতে কেউ তা চুরি করে নিয়ে যেতে না পারে। শিমার এতে রাজি হয়। আজর তার পরিবারের সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, এ মাথা তারা কারবালায় নিয়ে যাবে এবং সেখানে দাফন করবে। পরদিন সকালে শিমার তার নিকট থেকে মাথা চাইলে সে তা দিতে অস্বীকার করে। কিন্তু শিমার একটি কাটা মাথা হলেই চলে যাবে এ কথা বললে আজর প্রথমে তার বড় ছেলেকে হত্যা করে মাথা কেটে এনে শিমারকে দেয়। কিন্তু শিমার এ মাথা নিতে অস্বীকার করে আবারও একটি কাটা মাথার কথা বলে। এভাবে এ ব্যক্তি পরপর তার তিন ছেলেকেই হত্যা করে মাথা কেটে শিমারকে দেয়। কিন্তু শিমার মনে করে আজর হয়ত অর্থের লোভে ইমামের মাথা দিতে চাচ্ছে না। অবশেষে শিমার আজরকে হত্যা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করে ইমামের মাথা নিয়ে ইয়াযীদের দরবারে উপস্থিত হয়। ইয়াযীদের দরবার হতে সেই মাথা ঊর্ধ্বে উঠে যেতে যেতে একসময় অদৃশ্য হয়ে যায়।

অপরদিকে ইমাম হুসাইনের বৈমাত্রেয় ভাই মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়া এ সময় আম্বাদ নগরীর রাজা ছিলেন। হযরত আলী হযরত ফাতিমার অজ্ঞাতসারে এক নারীকে বিয়ে করেন যাঁর গর্ভে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়ার জন্ম হয়। তিনি কারবালায় ইমাম হুসাইনের আগমন ও সেখানে তাঁর অবরুদ্ধ হবার কথা জানতে পেরে সৈন্যসহ বের হন। কিন্তু তিনি পথিমধ্যে সংবাদ পান যে, ইমাম হুসাইন শহীদ হয়েছেন এবং নবী পরিবার দামেশকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মুহাম্মাদ ইবনে হানাফিয়া তাই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে প্রথমে মদীনা অভিযানে বের হন এবং তা দখল করে নেন। তিনি শিমারকে শাস্তি দেন। এরপর দামেশক অভিমুখে যাত্রা করেন। দামেশকে ইয়াযীদের সেনাবাহিনীর সাথে তাঁর যুদ্ধ শুরু হয়। ইতিমধ্যে ইমাম যায়নুল আবেদীন বন্দীদশা থেকে পালিয়ে যান।

এজিদ বধ পর্ব : এ পর্বের বিষয়বস্তু হল ইয়াযীদের পলায়ন ও গুপ্তপুরীতে প্রবেশ এবং মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়ার বন্দীত্ব। নিচে এ বিষয়গুলো সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়ার সেনাদলের সাথে ইয়াযীদের সেনাদলের প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়। ইয়াযীদের বাহিনী পরাজিত হয় এবং ইয়াযীদ পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়া তার পশ্চাদ্ধাবন করেন। অনেক চেষ্টার পরও তিনি ইয়াযীদকে ধরতে ব্যর্থ হন। ইয়াযীদ দামেশকের রাজপ্রাসাদের পাশে একটি ভূগর্ভস্থ গুপ্তপুরীতে প্রবেশ করে। তাকে ধরতে ব্যর্থ হওয়ায় যুদ্ধ শেষেও হানাফীয়ার ক্রোধ থেকে যায়। তিনি অনেককে হত্যা করেন। এ অপরাধে তাঁর জন্য গায়েবী শাস্তি অবতীর্ণ হয়। অত্যুচ্চ প্রস্তরময় প্রাচীর তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তিনি সেখানে বন্দী থাকবেন।

উপসংহার : এ অংশে ইমাম যায়নুল আবেদীনের সিংহাসনে আরোহণ, নবী পরিবারের মুক্তি ও ইমামের সপরিবারে মদীনায় প্রত্যাবর্তনের বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পর্যালোচনা

মীর মশার্‌রফ হোসেন রচিত বিষাদ সিন্ধু একটি ধর্মীয় গ্রন্থ নাকি ঐতিহাসিক গ্রন্থ এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। অনেকে একে ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাসও বলেছেন। তবে বাস্তবতা হল বাংলাদেশের লক্ষ-কোটি মুসলমানের কাছে এটি ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবেই সমাদৃত। এতে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনাকে এ দেশের মানুষ সত্য বলে গ্রহণ করে এবং এ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকে। সম্ভবত মীর মশার্‌রফ হোসেন নিজেই চেয়েছেন মানুষ একে ধর্মীয় ঐতিহাসিক গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করুক। এরূপ ধারণা করার কারণ হল তিনি মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধর্মীয় বিধানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যেমন পর্দার বিধান, দেনমোহরের বিধান ইত্যাদি।

এ উপন্যাসে যে বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে সেগুলো হল :

১. মহান আল্লাহ্‌র ওপর সকল অপকর্মের দায়ভার চাপানো অর্থাৎ অদৃষ্টবাদী মতবাদ প্রতিষ্ঠা।

২. ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের প্রতি আমীরে মু'আবিয়ার অপরিসীম ভালবাসা প্রদর্শন।

৩. ইমাম হাসানের সাথে ইয়াযীদের সংঘাতের মূল কারণ একজন নারী। যে নারীকে ইয়াযীদ বিয়ে করতে চেয়েছিল ইমাম হাসানও তাকেই বিয়ে করতে চান। আর এ থেকেই ইয়াযীদের সাথে ইমামের শত্রুতা শুরু হয় এবং তাঁকে ইয়াযীদের প্ররোচণায় বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

৪. ইমাম হুসাইন তাঁর ভাইয়ের হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই ইয়াযীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অবশেষে কারবালায় নির্মমভাবে নিহত হন।

অর্থাৎ একটি বিয়ের বিষয়কে কেন্দ্র করে পুরো উপন্যাস রচিত হয়েছে। বনু উমাইয়্যার শাসনব্যবস্থার অত্যাচার ও তাদের অনৈসলামী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ইমামগণের প্রতিরোধের বিষয়কে তিনি তাঁর উপন্যাসে কোথাও আনেননি।

সাহিত্যের কোন বিষয় যখন নিরেট সাহিত্যের মধ্যে অবস্থান না করে সমাজ জীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তা নিয়ে আলোচনা, পর্যালোচনা ও সমালোচনা হওয়াটাই স্বাভাবিক। বিষাদ সিন্ধুর ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটিই ঘটেছে। যেভাবে এ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

উপন্যাস লেখা হয়েছে তাতে এর মধ্যে ধর্মীয় বিষয় ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের বিকৃত ইতিহাসকে উপজীব্য করা হয়েছে। আর এজন্যই এ নিয়ে প্রবন্ধ লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। প্রয়োজন রয়েছে এমন রচনার বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপনেরও।

যে কোন রচনারই সমাজের জনগণের ওপর কম-বেশি প্রভাব থাকে। মীর মশার্‌রফ হোসেনের এ উপন্যাসও এ দেশের মানুষের মনে প্রভাব ফেলে; শুধু প্রভাব ফেলে বললে ভুল বলা হবে; বরং বলতে হবে মানুষের মনের গভীরে স্থান লাভ করে। এমনকি এ গ্রন্থকে ধর্মীয় গ্রন্থের মর্যাদাও দেওয়া হয়। এমন সময়ও ছিল যখন মানুষ ভক্তিভরে একে কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে রেখে দিত। পাঠ করার পর এতে চুমু খেত।

সমাজে প্রচলিত যে কোন ভুল ধারণার অপনোদন বা যে কোন কুসংস্কারের মূলোৎপাটন সময়সাপেক্ষ ও দুরূহ বিষয়। অনেক সময় কোন অপপ্রচার বা বিকৃতিকে দূর করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। মীর মশার্‌রফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু আমাদের সমাজে কারবালার মহান ঘটনার বিকৃত রূপই প্রচার করেছে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, জ্ঞানী-মূর্খ নির্বিশেষে সকলের কাছে বিষাদ সিন্ধুই সত্য। এর কারণ হল লেখক একে এভাবেই উপস্থাপন করেছেন। যেমন কোথাও কোথাও এভাবে বলেছেন যে, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে যেন পাঠক মনে করে যে, এতে বর্ণিত অন্য সকল বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে কোন মতপার্থক্য নেই অর্থাৎ এগুলোর সবই সত্য।

আমাদের সমাজে এ বাস্তবতারই একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বইমেলায় এক শিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁর স্কুল পড়ুয়া ছেলেকে নিয়ে এসেছেন। একটি স্টলে ইমাম হুসাইনের শাহাদাত সম্পর্কিত একটি গ্রন্থ দেখে ছেলেটি বাবার কাছে সে গ্রন্থ কিনে দেওয়ার জন্য আবদার করে। কিন্তু এ বাবা তাকে বিষাদ সিন্ধু কিনে দেওয়ার কথা বলে নিয়ে গেলেন। এ ঘটনা একটি নমুনা মাত্র। আমি অনেক ব্যক্তির কাছেই এমন শুনেছি যে, বিষাদ সিন্ধুতেই কারবালার প্রকৃত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে মীর মশার্‌রফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু একটি কাল্পনিক উপন্যাস বা উপাখ্যান। এতে শুধু কয়েকটি ঐতিহাসিক নাম ব্যবহার করা হয়েছে এবং ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা ও কাবাবালায় ইমাম হুসাইনের সপরিবারে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

শাহাদাতবরণের সত্য কথা বলা হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ঐতিহাসিকভাবে সত্য আর কোন ঘটনাই বর্ণিত হয়নি। তাই এটাকে 'ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস' বলাটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত সেটাও বিবেচনার বিষয়। মাত্র কয়েকটি নামের ব্যবহারেই একটি উপন্যাস ইতিহাস আশ্রিত বলা যায় না।

বিষাদ সিন্ধুর সাহিত্যমান নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। মীর মশার্‌রফ তাঁর সহজাত প্রতিভার মাধ্যমে এর ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি যেভাবে ঘটনার পট সাজিয়েছেন এবং ধীরে ধীরে মানুষের মনে পরবর্তী ঘটনা জানার ব্যাপারে আগ্রহ সৃষ্টি করেছেন, যেভাবে ঘটনাকে আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করেছেন তা সত্যিই অনবদ্য। পাঠকদের মনে তিনি ঔৎসুক্য সৃষ্টি করেছেন, তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি বাড়িয়ে দিয়েছেন, কারবালার ঘটনা বর্ণনায় পাঠকদের কাঁদিয়েছেন খুব সাবলীলভাবে। তাই উপন্যাসের সাহিত্যমান নিয়ে লেখার কিছু নেই।

কিন্তু যে বিষয়টি আমাদের আহত করে এবং যে দিকটিকে এতকাল উপেক্ষা করা হয়েছে তা হল এ উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা নির্বাচন। তিনি এমন দু'জন মহান ব্যক্তিত্ব ও তাঁদের জীবনের মর্মান্তিক ঘটনাকে উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন যে, মনে হয় তিনি জানতেন এ দেশের পাঠকমাত্রই তাঁর এ গ্রন্থ লুফে নেবে। আপত্তি থাকত না যদি তিনি সত্য ঘটনাকে আশ্রয় করে তা লিখতেন। কিন্তু তিনি এ উপন্যাস সৃষ্টির মাধ্যমে ইসলামের মহান ব্যক্তিত্ব ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের চরিত্রে কালিমা লেপন করেছেন। ইমাম হুসাইনের মহান আন্দোলনকে কালিমালিপ্ত করেছেন। সে কারণে আমার আলোচনা এ বিষয়কে কেন্দ্র করেই।

ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন কেবল মুসলমানদের আদর্শ নন; বরং তাঁরা মানব জাতির জন্য আদর্শ। অমুসলিম বিখ্যাত ব্যক্তিগণ, যেমন টমাস কার্লাইল, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ ইমাম হুসাইন থেকে অনুপ্রেরণা পাওয়ার কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা.) তাঁদের 'বেহেশতের যুবকদের নেতা' বলেছেন। তাই আমরা এটা কখনই সমর্থন করতে পারি না যে, তাঁদের নিয়ে এমন কিছু লেখা হোক যেটা তাঁদের মর্যাদার পরিপন্থী।

লেখকদেরও নীতি-নৈতিকতার প্রশ্ন রয়েছে। দায়বদ্ধতার ব্যাপার রয়েছে। ইচ্ছা করলেই যে কোন বিষয় সম্পর্কে বা যে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে যা খুশি লেখা যায় না। আমরা যদি আমাদের দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের কথা লিখতে চাই তবে এ মহান যুদ্ধের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

প্রতি সম্মান রেখে যা সত্য তা-ই লিখতে হবে। যদি আমাদের জাতীয় নেতাদের নিয়ে কিছু লিখতে চাই তবে তাঁদের সম্মানের দিকটি লক্ষ্য রেখে সত্য বিষয়গুলোই লিখতে হবে, কোন কল্পকাহিনী নয়। কোন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের সম্মানহানী করে লেখা কখনই সমর্থনযোগ্য নয়। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের ক্ষেত্রে তো নয়ই, এমনকি সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রেও মিথ্যা বলার মাধ্যমে তার ব্যক্তিত্বকে অপমান করার অধিকার কারও নেই। আবার কারও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগে কিনা সেটি বিবেচনার ব্যাপার রয়েছে। ইমাম হুসাইন (আ.)-এর ইসলামের পুনরুজ্জীবন দানের মহা ঘটনাকে মীর মশার্‌রফ হোসেন এমন এক বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত করেছেন যা ইসলামের এ মহান আন্দোলনের মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করেছে।

বিভিন্ন সময়ে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে নিয়ে রচিত গল্প, উপন্যাসগুলোতে তাঁদের বাস্তব চরিত্রকে আশ্রয় করা হয়েছে। মোঘল সম্রাট আকবর, বাংলার নবাব সিরাজুদ্দৌলা, কিংবা শেরে মহীসূর টিপু সুলতানকে নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলোকে আমরা ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস বলতে পারি। ইতিহাসের সত্যতার দিকে লক্ষ্য রেখে কিছু কিছু কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনা ঔপন্যাসিকরা এতে যোগ করেছেন। কিন্তু মূল ঘটনা বর্ণনায় তাঁরা ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেছেন। সিরাজুদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিষয়টি উপন্যাসে এসেছে ইতিহাসকে অবলম্বন করেই। আকবরের কাহিনীতে বাস্তবতা দেখতে পাই। অন্যদিকে বিষাদ সিন্ধুতে কয়েকটি সত্য নাম ও কারবালায় হত্যাকাণ্ডের সত্য ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র। এর বাইরে আগাগোড়া এটি একটি কাল্পনিক উপন্যাস। যদি মীর মশার্‌রফ হোসেন চাইতেন তাহলে ইতিহাসের প্রতি বিশ্বস্ত থেকেই তিনি তা রচনা করতে পারতেন।

আবার এ নামগুলো ব্যবহার না করে এ ধরনের উপন্যাস রচনা করাও মীর মশার্‌রফ হোসেনের পক্ষে সম্ভব ছিল। কিন্তু তাঁর ভয় ছিল এটাকে পাঠক কর্তৃক সমাদৃত হওয়ার জন্য ধর্মের আশ্রয় না নিলে চলবে না। তিনি খুব চতুরতার সাথে সে কাজটিই করেছেন। তাই একে ইতিহাস আশ্রয়ী না বলে মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি আশ্রয়ী উপন্যাস বলা যায়। বিষাদ সিন্ধুর শুরুতে উপক্রমণিকায় মুসলমানদের হৃদয়ের মনিকোঠায় যাঁদের অবস্থান সেসব মহান ব্যক্তিত্ব প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) ও তাঁর দুই নাতির বিষয় বর্ণিত হয়েছে। মহানবী (সা.) কর্তৃক তাঁর দুই নাতির শাহাদাতের ভবিষ্যদ্বাণী করার মাধ্যমে এ উপন্যাসের প্রতি পাঠকদের চরমভাবে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আকৃষ্ট করা হয়েছে। পাঠকমাত্রই এ কয়েকটি অনুচ্ছেদ পড়ার পর এ গ্রন্থের প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ না করে পারবেন না। যদি তিনি ধর্মীয় অনুভূতিকে আশ্রয় না করতেন তবে এ গ্রন্থ পাঠকপ্রিয় হত কিনা সন্দেহ রয়েছে। থাক না এতে চমৎকার বাক্যগঠন, ভাষার সাবলীলতা অথবা অন্য কোন চমক।

বহুল প্রচলিত মিথ্যা

মীর মশার্‌রফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধুর যে বিষয়গুলো আমাদের সমাজে বেশি বেশি চর্চা হয় সেগুলো সম্পর্কে কিছু কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি যেন বিশেষভাবে এগুলোর মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে আমাদের মনে সংশয়ের সৃষ্টি না হয়।

সত্য হল এটাই যে, ইয়াযীদের রাজত্বকালে ইমাম হাসান জীবিত ছিলেন না। মু'আবিয়ার জীবদ্দশাতেই ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। মুহররম পর্বে বর্ণিত ইমাম হাসানের সাথে জয়নাবের বিয়ের ঘটনা, মদীনার সেনাবাহিনীর সাথে ইয়াযীদের সেনাবাহিনীর যুদ্ধ এবং কারবালায় ময়দানে কাসেমের সাথে সাকীনার বিয়ের বিষয়টি একেবারেই কাল্পনিক।

উদ্ধারপর্বে বর্ণিত সাকীনার আত্মহত্যা, আজরের একে একে তিন সন্তানকে হত্যা, ইমাম হুসাইনের শির মোবারকের অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, হযরত ফাতিমার জীবদ্দশায় হযরত আলীর অন্য নারীকে বিয়ে করা, সেই নারীর সন্তানকে রাসূলের কাছে নিয়ে আসা, মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়ার সাথে ইয়াযীদের যুদ্ধ এবং ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-এর পলায়নের ঘটনা সম্পূর্ণরূপে কাল্পনিক।

এজিদ বধ পর্বে বর্ণিত যুদ্ধে ইয়াযীদের পরাজয় ও গুপ্তপুরীতে প্রবেশ এবং মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়ার কিয়ামত পর্যন্ত বন্দি থাকার ঘটনাও কাল্পনিক।

সত্য ইতিহাস

যদি কারবালার সত্য ইতিহাসের কিছুই উল্লেখ না করি তবে এ প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই খুব সংক্ষেপে কারবালার মহাঘটনা সংঘটনের ইতিহাস এখানে তুলে ধরা

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

হল। হযরত আলী (আ.)-এর শাহাদাতের পর ইমাম হাসান (আ.) খলীফা হন। কিন্তু মু'আবিয়া হযরত আলীকে অস্বীকার করার মত ইমাম হাসানকেও খলিফা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ইমাম হাসান মু'আবিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে বের হন। কিন্তু মু'আবিয়া অর্থ-সম্পদ ও পদমর্যাদার প্রলোভন দেখিয়ে ইমাম হাসানের সৈন্যদের কিনে নেন। এমনকি ইমাম হাসানের প্রধান সেনাপতি ওবায়দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসও রাতের অন্ধকারে নিজের দীন বিক্রি করে মু'আবিয়ার দলে যোগ দেন। ইমাম হাসান মু'আবিয়ার সাথে সন্ধি করেন। সন্ধির অন্যতম শর্ত ছিল মু'আবিয়ার মৃত্যুর পর খেলাফত ইমাম হাসান (আ.)-এর কাছে আসবে। আর তিনি জীবিত না থাকলে তা ইমাম হুসাইন (আ.)-এর কাছে আসবে। কিন্তু মু'আবিয়া মৃত্যুর পূর্বেই সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করে তাঁর ফাসেক পুত্র ইয়াযীদকে মুসলমানদের খলিফা মনোনীত করেন। মু'আবিয়ার মৃত্যুর পর ইয়াযীদ খলিফা হয়। সে মদীনার গভর্নরকে নির্দেশ দেয় যাতে সে ইমাম হুসাইনের নিকট থেকে তার খেলাফতের পক্ষে স্বীকারোক্তি আদায় করে। ইমাম হুসাইন ইয়াযীদকে খলীফা বলে মেনে নিতে অস্বীকার করেন এবং তাঁর দীনি আন্দোলন শুরু করেন। তিনি পবিত্র মক্কা নগরীতে চলে যান। সেখানে অবস্থানকালে তাঁকে কুফায় গিয়ে নেতৃত্ব গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে কুফা থেকে হাজার হাজার চিঠি প্রেরণ করা হয়। অন্যদিকে হজ্বের সময় তাঁকে গুপ্তঘাতক দ্বারা হত্যা করা হবে জানতে পেরে তিনি হজ্ব অসমাপ্ত রেখেই কুফার দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি ইয়াযীদের সেনাবাহিনী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে কারবালায় নীত হন। এখানে ইয়াযীদের সেনাবাহিনীর সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে তিনি তাঁর পরিবারের সদস্য এবং সঙ্গী-সাথীসহ তিন দিনের পিপাসার্ত অবস্থায় হাজার হাজার শত্রুসৈন্যের মোকাবিলায় শাহাদাত বরণ করেন।

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইমাম হুসাইন (আ.)-এর পরিবারের নারী ও শিশুদের তাঁবুগুলোতে ইয়াযীদের সেনারা আক্রমণ চালিয়ে লুটপাট করে এবং পরে অগ্নিসংযোগও করে। ইমাম হুসাইনের একমাত্র জীবিত পুত্র ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.) ও ইমাম হুসাইনের বোন হযরত যায়নাবসহ সকলকে বন্দি করা হয়। তাঁদের হাতে-পায়ে শিকল পরিয়ে প্রতিটি জনপদ ও বাজারে ঘুরিয়ে প্রথমে কুফায় উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদের দরবারে ও পরে দামেশ্‌কে ইয়াযীদের দরবারে নিয়ে যাওয়া হয়। ইয়াযীদের সৈন্যরা যাত্রাপথে ইমাম হুসাইনসহ তাঁর সঙ্গীসাথীদের কাটা মাথাগুলো বর্শায় বিদ্ধ করে এ বন্দি কাফেলার সম্মুখভাগে বহন করে যাতে ইমাম-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিবারের সদস্যদের দুঃখ আরও বৃদ্ধি পায়। ইয়াযীদের দরবারে ইমাম হুসাইনের পবিত্র মাথা একটি পাত্রে রাখা হলে ইয়াযীদ উল্লাস প্রকাশ করে।

ইয়াযীদ ইমাম যায়নুল আবেদীন (আ.)-কে হত্যা করতে চায়, কিন্তু হযরত যায়নাবের সাহসী ভূমিকার কারণে সে এ কাজ হতে বিরত হয়। কিছুদিন বন্দি অবস্থায় রাখার পর ইমাম হুসাইনের পরিবার-পরিজনকে মদীনায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়ার সাথে শিমারের কোন যুদ্ধ হয়নি এবং তিনি শিমারকে শাস্তিও দেননি; বরং যখন মুখতার সাকাফী কুফার শাসনক্ষমতা থেকে বনী উমাইয়্যাকে উচ্ছেদ করেন তখন তিনিই শিমার, উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদসহ ইমাম হুসাইনের হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সবাইকে শাস্তি দেন।

মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়া ইমাম হুসাইনের পরিবারকে উদ্ধারের জন্য দামেশ্‌কেও কোন অভিযান পরিচালনা করেননি। আর তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়েরের খেলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে যে, আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের মুহাম্মাদ ইবনে হানাফীয়াকে রাযওয়া নামক স্থানে নির্বাসনে প্রেরণ করেন। সেখানেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক বলেছেন যে, তাঁকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়।

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

যা হোক, ইমাম হুসাইন কেন পবিত্র মদীনায় অবস্থান না করে মক্কা শরীফে গেলেন, আর কেনই বা কুফাবাসীর বিশ্বাসঘাতকতার অতীত ইতিহাস জানা সত্ত্বেও কুফায় যাওয়ার জন্য মক্কা থেকে বের হলেন, কেন তিনি মু'আবিয়ার সময় বিদ্রোহ করলেন না, অথচ ইয়াযীদের সময় বিদ্রোহ করলেন, তাঁর আন্দোলনের কারণই বা কী ছিল এসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বিভিন্ন গ্রন্থে এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। অনেক গ্রন্থে ইমাম হুসাইন (আ.) আন্দোলনের শুরু থেকে তাঁর শাহাদাতবরণ পর্যন্ত যেসব বক্তব্য প্রদান করেছেন সেসব ভাষণ উদ্ধৃত হয়েছে। বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যেসব গ্রন্থ আমাদের এ বিষয়গুলো জানতে সাহায্য করবে সেগুলো হল :

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

১. ওয়াইজম্যান পাবলিকেশনস কর্তৃক প্রকাশিত শেইখ আব্বাস কুম্মী সংকলিত নাফাসুল মাহমুম গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ 'শোকার্তের দীর্ঘশ্বাস' (১ম ও ২য় খণ্ড);

২. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর কর্তৃক প্রকাশিত আয়াতুল্লাহ শহীদ মূর্তাজা মোতাহ্হারী প্রণীত হামাসায়ে হুসাইনী গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ গ্রন্থ 'ইমাম হোসাইন (আ.)-এর কালজয়ী বিপ্লব';

৩. হযরত আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ হুসাইন ফাযলুল্লাহ'র দপ্তর, কোম, ইরান থেকে প্রকাশিত আয়াতুল্লাহ আল উযমা সাইয়্যেদ মোহাম্মদ হুসাইন ফাযলুল্লাহ প্রণীত 'আশুরার শিক্ষা';

৪. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর কর্তৃক প্রকাশিত আয়াতুল্লাহ মূর্তাজা মোতাহ্হারী প্রণীত 'শহীদ';

৫. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর কর্তৃক প্রকাশিত ড. আলী শরীয়তী প্রণীত 'জাগো সাক্ষ্য দাও';

৬. আল হোসেইনী প্রকাশনী কর্তৃক প্রকাশিত সাইয়েদ ইবনে তাউস প্রণীত বিখ্যাত গ্রন্থ লুহুফ-এর বাংলা অনুবাদ 'কারবালা ও হযরত ইমাম হোসাইন (আ.)-এর এর শাহাদাত';

৭. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলরের দফতর কর্তৃক প্রকাশিত 'আশুরা সংকলন'।

গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা ইমাম হুসাইনের আন্দোলন এবং ঐতিহাসিক সত্য ঘটনাগুলোকে জেনে নিতে পারব।

একটা সময় যখন বাংলা ভাষায় ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করে বা শাহাদাতের হৃদয়বিদারক ঘটনার সত্যচিত্র তুলে ধরে এমন গ্রন্থ ছিল না তখন মানুষ বিষাদ সিন্ধুকে সাদরে গ্রহণ করেছিল তাদের জিজ্ঞাসু মনের পিপাসা মেটাবার জন্য। কিন্তু আজ যখন সত্য ঘটনার বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত গ্রন্থ পাওয়া যাচ্ছে তারপরও এ দেশের মানুষের কাছে বিষাদ সিন্ধুর সেই ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক গ্রন্থের মর্যাদা অটুট রয়ে গেছে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অনেক উপন্যাস, নাটক, গল্প ইত্যাদি নিয়ে বিভিন্ন সময় সমালোচনা করা হয়েছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা রাজনৈতিক উপন্যাসের বিরুদ্ধেও সমালোচনা হয়েছে। আশ্চর্য বোধ হয় যে, মুসলমানদের অন্যতম প্রধান ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের চরিত্র হননের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ওঠেনি। একই সাথে ব্যথিত হই এ ভেবে যে, বেহেশতের যুবকদের নেতাদের চরিত্রের ওপর কালিমা লেপনকারী সাহিত্য কীভাবে মুসলমানদের কাছে গ্রহণীয় হয়ে গেল? পরিশেষে বলতে চাই, যদি লেখকের যা খুশী লেখার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া হয় তবে নীতি-নৈতিকতাকে আমাদের বিদায় জানাতে হবে। মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি সম্মান ও মর্যাদার বিষয়টি খেলো হয়ে যাবে। নিশ্চয়ই আমরা আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের নিয়ে উপহাস বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে পারি না। যদি আমরা তা করি তবে সভ্য মানুষ হিসাবে পরিচয় দিতে আমাদের বারবার ভাবতে হবে।

আসুন, সত্য ইতিহাস প্রচারের মাধ্যমে কারবালার ঘটনা সম্পর্কে মানুষের মনে যে ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে তার অপনোদন করি। মানুষ হিসাবে আমাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করি।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

দর্শনের যে কথা জানা হয়নি

[শহীদ আয়াতুল্লাহ্ মোর্তাজা মোতাহ্হারীর রচনা অবলম্বনে]

আব্দুল কুদ্দুস বাদশা*

মানবের সকল পবিত্র বিষয়ের মধ্যে 'জ্ঞান' হল একমাত্র ও অদ্বিতীয়, যা বংশ, গোত্র, মত ও পথ নির্বিশেষে সকলে পবিত্র বলে গণ্য করে থাকে, আর এর মহিমা, পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে থাকে। এমনকি মূর্খতম লোকটিও জ্ঞানকে তুচ্ছ গণ্য করে না।

জ্ঞানের এ সর্বজনপ্রিয়তা ও মর্যাদা কেবল এ কারণে নয় যে, এটা জীবনের সর্বোৎকৃষ্ট হাতিয়ার এবং জীবন সংগ্রামে মানুষকে শক্তি যোগায়, সক্ষমতা বয়ে আনে এবং প্রকৃতির ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে। যদি কথা এটাই হত, তাহলে মানুষের উচিত ছিল অন্যান্য জীবনোপকরণকে যে দৃষ্টি থেকে দেখা হয়, জ্ঞানকেও সে দৃষ্টিতে দেখা।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাস সেসব কষ্ট-ক্লেশ, বঞ্চনা আর দুঃখে ভরা, যা পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীরা জ্ঞান অর্জনের পথে বরণ করেছেন এবং বস্তুগত জীবনকে নিজেদের জন্য তিক্ত করে ফেলেছেন। আর যদি জ্ঞানের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও আকর্ষণ শুধু এ কারণে হয়ে থাকে যে, তা জীবনের বস্তুগত চাহিদা মেটাবার হাতিয়ার, তাহলে জ্ঞানের পথে এতসব ত্যাগ ও জীবনের সুখ-শান্তি বর্জন করার কী অর্থ থাকে?

আসলে মানবাত্মার সাথে জ্ঞানের সম্পর্কের বন্ধন এসব নীচ ও হীন বন্ধনের অনেক ঊর্ধ্বে, যেগুলো প্রাথমিকভাবে কল্পনা করা হয়ে থাকে। জ্ঞান যত বেশি নিশ্চিত এবং

---

*লেখক : এম ফিল গবেষক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সংশয়, সন্দেহ ও অজ্ঞতা বিদূরণকারী হবে, যত বেশি সর্বব্যাপী এবং বৃহৎ থেকে বৃহত্তর পর্দা উন্মোচনকারী হবে, তত বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও কাঙ্ক্ষিত হবে।

মানুষের অজানার বিশাল জগতের মধ্যে কিছু বিষয় রয়েছে যেগুলো জানার আগ্রহ তুলনামূলকভাবে বেশি। গুরত্বের দিক দিয়েও সেগুলোর স্থান তালিকার শীর্ষে। এ বিষয়গুলো হল জগৎ সম্পর্কিত সামগ্রিক বিষয়ের রহস্য উদ্ঘাটন। মানুষ সফল হোক আর না হোক, এ বিশ্বের উৎপত্তি ও পরিণতি, সৃষ্টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আদি-অনাদি, একত্ব-বহুত্ব, সসীম-অসীম, কার্যকারণ, স্রষ্টা-সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে অনুসন্ধান ও চিন্তা-অনুধ্যান না করে পারে না। আর মানুষের এ সহজাত স্পৃহাই 'দর্শন'-কে মানুষের জন্য উপহার হিসাবে এনেছে। দর্শন, জগতের আপাদমস্তক মানুষের চিন্তার অঙ্গনে হাজির করে, মানুষের বুদ্ধি ও চিন্তাকে নিজ ডানার ওপর বসিয়ে মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ সীমানায় ভ্রমণ করায়, এমন সব জগতে যেখানে পরিভ্রমণ করা মানুষের পরম লক্ষ্য।

দর্শনের ইতিহাস মানুষের চিন্তার ইতিহাসের সাথে একসূত্রে গাঁথা। তাই দর্শনের উৎপত্তি কোন্ যুগে হয়েছে কিম্বা কোন্ ভূখণ্ডে এর সূচনা সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। মানব তার সহজাত আকাঙ্ক্ষার বশে যখনই এবং যেখানেই চিন্তার অবকাশ লাভ করেছে, সেখানেই জগতের সামগ্রিক বিষয় নিয়ে মতামত প্রকাশে কুণ্ঠা করেনি। ইতিহাসের সাক্ষ্য অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত, যেমন মিশর, ইরান, ভারত, চীন ও গ্রীসে বিখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক মতাদর্শসমূহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁদের সেসব রচনার অনেকাংশই এখনও অবশিষ্ট রয়েছে। এসব প্রাচীন রচনার মধ্যে গ্রীক বিজ্ঞান ও দর্শনের সংখ্যাই বেশি, যা আজ থেকে প্রায় দু'হাজার ছয়শ' বছর আগে সেখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক মহা বিপ্লবের মতই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

চিন্তা ও দর্শনের এই যে বিপ্লব এশিয়া মাইনরের গা ঘেঁষে এবং গ্রীসে সূচিত হয়েছিল, তা আলেকজান্দ্রিয়ায় অব্যাহত থাকে। অতঃপর যখন আলেকজান্দ্রিয়া ও এথেন্সের জ্ঞানকেন্দ্র ধ্বংস ও পুরোপুরি বিলীন হয়ে যাবার উপক্রম হয় এবং পূর্ব রোমান সম্রাট জাস্টিনিন ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে এথেন্স ও আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্যাপিঠসমূহে তালা লাগিয়ে দেবার নির্দেশ জারী করেন, আর ভীত-সন্ত্রস্ত পণ্ডিতবর্গ আত্মগোপন করেন ও জ্ঞানকেন্দ্রগুলো বন্ধ হয়ে যায়, তখন পৃথিবীর আরেক প্রান্তে ইসলামের আলোকোজ্জ্বল

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সূর্যের উদয়ের মাধ্যমে আরেকটি বিপ্লবের সূচনা ঘটে এবং নবতর ও গভীরতর আরেকটি সভ্যতার দিগন্ত উন্মোচিত হয়। ইসলামের মহান নবী (সা.) ও মহান আউলিয়াবৃন্দের পক্ষ থেকে যেভাবে জ্ঞানের মর্যাদা এবং জ্ঞান অন্বেষণকারীদের প্রশংসা ও উৎসাহ যোগানো হয়েছে, তাতে জ্ঞান অন্বেষার অদম্য আকাঙ্ক্ষা পুনর্বার অন্তরে অন্তরে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। এভাবে বিশাল ইসলামী সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ওপর মৌলিক গ্রন্থাবলি রচিত ও লিপিবদ্ধ হয়। বিভিন্ন ভাষা, বিশেষ করে গ্রীক ভাষার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলি অনূদিত হয়, বৃহত্তর বিদ্যাপিঠ ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করা হয়, অসংখ্য গ্রন্থাগার গড়ে ওঠে, ইসলামী ভূখণ্ডের বৃহৎ নগরীসমূহ জ্ঞানচর্চার লালনভূমিতে পরিণত হয় এবং সেসব স্থান আজকের ইউরোপসহ দেশি-বিদেশি অগণিত জ্ঞান-পিপাসুর পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে। এভাবে কয়েক শতাব্দী অতিবাহিত হওয়ার পর ইউরোপে নতুন এক বিপ্লবের উন্মেষ ঘটে। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে সাধিত হয় এক অভূতপূর্ব বিবর্তন।

তবে যে বিষয়টি ইতিহাসের দৃষ্টিতে একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য বিষয়, তা হল প্রাচীন গ্রীসও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল উৎসসমূহ প্রাচ্য থেকেই পেয়েছিল। গ্রীসের বিখ্যাত পণ্ডিতগণ অনেকবার প্রাচ্য ভ্রমণ করেন এবং প্রাচ্যের পণ্ডিতদের সাধনালব্ধ জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে অবলীলায় গ্রহণ করেন। অতঃপর স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে উক্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ছড়িয়ে দেন। সে যুগে গ্রীকরা প্রাচ্যের জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে কতটুকু গ্রহণ করেছিলেন কিম্বা বিগত এক হাজার বছর পূর্বে আজকের ইউরোপ ইসলামী সভ্যতার বিজ্ঞান ও দর্শনের ভাণ্ডার থেকে কতটুকু উপকৃত হয়েছিল কিম্বা মুসলমানরা গ্রীক দর্শনকে কীভাবে গ্রহণ করে এবং তাতে কতটা সংযোজন করে ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে স্বতন্ত্র গবেষণার দাবি রাখে। তবে এখানে শুধু বিগত সাড়ে তিনশ' বছরের ইসলামী দর্শনের একটি ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা হল, যে কথা অনেকেরই জানা হয়নি। অন্য কথায়, যে বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দুঃখজনকভাবে খুব কমই আলোচনা করা হয়। বিশ্বে, বিশেষ করে শিক্ষিত মুসলিম যুব শ্রেণী, যারা ইউরোপীয় সূত্রাবলি হতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্যাবলি লাভ করে থাকে, তাদের কাছে এ ইতিহাস যথাযথভাবে উপস্থাপিত হয়নি।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ইসলামী এ দর্শন যা 'হিকমাতে মুতাআলিয়া' (উচ্চতর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রজ্ঞা) নামে প্রসিদ্ধ, তা সাদরুল মুতাআল্লেহীন শিরাজী ওরফে মোল্লা সাদ্‌রার মাধ্যমে হিজরি একাদশ শতকে (খ্রিস্টিয় অষ্টাদশ শতকে) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীকালে পারস্যের দর্শন চর্চা এ দর্শন শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই অগ্রসর হয়, যার মূল ভিত রচিত হয়েছিল হিকমাতে মুতাআলিয়া দর্শনে।

মোল্লা সাদরার গবেষণা বেশিরভাগই 'উচ্চতর দর্শন' ও 'ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা' সম্পর্কিত। এ ক্ষেত্রে মোল্লা সাদরা প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকবৃন্দ, বিশেষ করে প্লেটো ও অ্যারিস্টটল থেকে যা কিছু পাওয়া গিয়েছিল এবং ফারাবী, ইবনে সিনা, শেখ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ মুসলিম হাকিমগণ এ মর্মে যে ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা উপস্থাপন কিম্বা সংযোজন করেছিলেন, আর অধ্যাত্মবাদী মরমী সাধকবৃন্দ স্ব স্ব সাধনায় যে সিদ্ধি লাভ করেছিলেন সে সমস্তই উত্তমভাবে আয়ত্ত করেছিলেন এবং নতুনভাবে একটি দার্শনিক ভিত্তির গোড়াপত্তন করেছিলেন এবং একে অকাট্ট ও অখণ্ডনীয় মৌলনীতিমালা দ্বারা সুরক্ষিত করেছিলেন। তিনি যুক্তি-প্রমাণের দিক থেকে দর্শনের সমস্যাবলিকে গাণিতিক সূত্রের ওপর দাঁড় করান, যেগুলোর একটি অপরটি থেকে নিঃসৃত ও প্রমাণিত হয়। এভাবে তিনি দর্শনকে প্রমাণ ও প্রতিষ্ঠার পন্থাগুলোকে বিক্ষিপ্ত অবস্থা থেকে বের করে আনেন।

অ্যারিস্টটল, যিনি স্বীয় দর্শনের গুরু প্লেটোর মতবাদসমূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তাঁর সময় থেকেই দর্শনের দু'টি ধারা সর্বদা একে অপরের সামন্তরালে এগিয়ে চলে, যে ধারা দু'টির প্রতিনিধিত্ব করে এসেছেন স্বয়ং প্লেটো এবং অ্যারিস্টটল। প্রতিটি যুগেই এ দু'টি দার্শনিক ধারার অনুসারী ছিল। মুসলমানদের মধ্যেও এ দু'টি ধারা 'ইশরাকী' এবং 'মাশশায়ী' নামে প্রসিদ্ধ। বিগত দু'হাজার বছর ধরে গ্রীস ও আলেকজান্দ্রিয়ায় যেমনভাবে, তেমনি মুসলমানদের মাঝে এবং মধ্যযুগে ইউরোপে এ ধারাদ্বয়ের মধ্যে দার্শনিক বিতর্ক অব্যাহত থাকে। কিন্তু সাদরুল মুতাআল্লেহীন যে নতুনভাবে একটি বুনিয়াদ গড়ে তোলেন, তাতে দু'হাজার বছর ধরে চলমান এ বিবাদের অবসান ঘটে। তিনি বিষয়টিকে এমনভাবে উপস্থাপন করেন যার ফলে তাঁর পরবর্তীকালে ইশরাকী ও মাশশায়ী ধারাদ্বয়ের একে অপরের মোকাবেলার কোন অর্থ হয় না। আর যাঁরা তাঁর উত্তরকালে আবির্ভূত হয়েছেন ও তাঁর এ দর্শনের সাথে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

পরিচয় লাভ করেছেন, তাঁরা এ ধারাদ্বয়ের মধ্যে চলে আসা দু'হাজার বছরের বিতর্ক মীমাংসিত অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন।

সাদরুল মুতাআল্লেহীনের দর্শন কোন কোন দিক থেকে যেমন অভিনব, অপরদিকে তেমনি তা ছিল মহান গবেষকদের সুদীর্ঘ আটশ' বছরের চেষ্টা-সাধনার ফসল, যাঁরা প্রত্যেকেই দর্শনের ঝাণ্ডাকে এগিয়ে নিতে অবদান রেখেছেন। কিন্তু এত কিছুর পরও প্রাচ্যবিদদের সাক্ষ্য অনুযায়ী দুঃখজনকভাবে আজ চারশ' বছরের অধিক কাল পেরিয়ে গেলেও এখনও পর্যন্ত ইউরোপে এ দর্শন সম্পর্কে এমনকি প্রাথমিক পরিচিতিটুকুও তুলে ধরা হয়নি। Prof. Edward Brawn একজন বিখ্যাত ইংরেজ প্রাচ্যবিদ (মৃত্যু ১৯২৫)। তিনি আজীবন পারস্য ও পারসিক ইতিহাস বিষয়ে গবেষণা করেছেন। তিনি History of Iranian Literature গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে বলেন : 'ইরানে মোল্লা সাদরার দর্শনের প্রসিদ্ধি ও প্রচলন থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর দর্শনের কেবল দু'টি সাধারণ ও অসম্পূর্ণ সংকলন ইউরোপীয় ভাষায় দেখেছি।' Cont Gobino মোল্লা সাদরার দর্শন-চিন্তা সম্পর্কে কয়েক পৃষ্ঠা লিখেছেন। কিন্তু দৃশ্যত তাঁর সবটুকুই তিনি সংগ্রহ করেছেন ইরানে তাঁর শিক্ষকবৃন্দের মৌখিক ভাষ্যাবলি থেকে। উপরন্তু, খোদ শিক্ষকবৃন্দেরই মোল্লা সাদরার দর্শন চিন্তা সম্পর্কে সম্যক অবগতি ছিল না বলে প্রতীয়মান হয়। Gobino মোল্লা সাদরা সম্বন্ধে যে বিবরণ লিখেছেন তার উপসংহারে বলেন : 'মোল্লা সাদরার দর্শন পন্থা হুবহু ইবনে সিনা থেকে গৃহীত।' অথচ রওযাতুল জান্নাত গ্রন্থের লেখক মোল্লা সাদরা সম্পর্কে লিখেছেন : 'মোল্লা সাদরা ছিলেন ইশরাকী দর্শনের চরম সমালোচনাকারী। আর মাশশায়ী দর্শনের দোষত্রুটির দরজা উন্মোচনকারী।' মোল্লা সাদরা সম্পর্কে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সত্যিকার ও সঠিকতম মূল্যায়ন করেছেন আল্লামা ইকবাল।

Prof. Edward Brawn তাঁর বইয়ে আরও লিখেছেন, 'মোল্লা সাদরার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হল 'আসফারে আরবাআ ও শাওয়াহিদুর রুবুবিয়্যাহ।' অতঃপর পাদটীকায় বলেছেন, Cont Gobino 'আসফার' কথাটির ভুল অর্থ করেছেন। আসফার কথাটি 'সিফ্‌র' এর বহুবচন, যার অর্থ হল 'কিতাব'। কিন্তু তিনি এর অর্থ করেছেন 'সফর' এর বহুবচন ধরে। এ কারণে তিনি তাঁর 'মধ্য এশিয়ার মাযহাবসমূহ ও দর্শন' শীর্ষক বইয়ের ৮১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন : 'মোল্লা সাদরা সফর বা ভ্রমণ বিষয়ক আরও কিছু বই লিখেছেন!'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আল্লামা ইকবাল লাহোরী ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সময় 'ইসলামে হিকমাত (দর্শন)-এর বিকাশ' শিরোনামে যে বইটি প্রকাশ করেন তা হস্তগত করা যায়নি। কিন্তু এটুকু নিশ্চিত যে, সেটা ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত।

এ দু'জন (Prof. Edward Brawn ও Cont Gobino) ছিলেন প্রাচ্যবিদদের অন্যতম। মরহুম শেখ মুহাম্মাদ খান কাযভীনি, যিনি দীর্ঘ প্রায় ত্রিশ বছর ধরে ইউরোপের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন ও গবেষণা চালিয়েছেন এবং সেখানকার অনেক প্রাচ্যবিদের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন, তিনি একবার বার্লিন থেকে প্রকাশিত 'ইরানশাহর' নামক পত্রিকায় Edward Brawn এর মৃত্যু উপলক্ষে একটি নিবন্ধে তাঁকে ইউরোপ ও আমেরিকার প্রাচ্যবিদদের মধ্যে ইরানের সাহিত্য, দর্শন ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-ভাণ্ডারের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আন্তরিক ও কঠোর অধ্যবসায়ী বলে উল্লেখ করেছেন। ঐ একই নিবন্ধে তিনি Cont Gobino সম্পর্কে লেখেন যে, তিনি ফ্রান্সের অত্যন্ত খ্যাতিমান একজন লেখক এবং দর্শন, সমাজ, ধর্ম, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে বহু গ্রন্থের প্রণেতা। Philosophy of History সম্পর্কে তিনি Gobinism খ্যাত বিশেষ এক মতবাদের প্রবর্তন করেন, যার অনেক অনুসারী জার্মানীতে রয়েছে।

মোটকথা, এত কিছুর পরও এ দু'জন প্রাচ্যবিদের একজন সাদরুল মুতাআল্লেহীনকে মাশশায়ী পন্থী, আর অন্যজন তাঁর বক্তব্য খণ্ডন করে 'রওযাতুল জান্নাত' গ্রন্থের (যা ছিল মূলত একটি ইতিহাস ও জীবনীমূলক গ্রন্থ) লেখনীকে সাক্ষ্য হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। একজনের মতে, আসফার হল সফরনামা। আরেকজনের মতে, আসফার হল সিফ্‌র বা কিতাব এর বহুবচন। অথচ এ দু'জনই যদি আসফার গ্রন্থের প্রথম কয়েকটি পৃষ্ঠা পড়তেন তাহলে দেখতে পেতেন যে, আসফার 'সিফ্‌র' এর বহুবচনও নয়, কোন সফরনামাও নয়। আর Edward Brawn যে শিক্ষকের মৌখিক ভাষ্যের কথা বলেছেন যিনি ইরানে Gobino কে মোল্লা সাদরার দর্শন শিক্ষা দিতেন, তিনি ছিলেন একজন ইয়াহুদী, মোল্লা লালেযার নাম্মী। এ শিক্ষকেরই সহযোগিতায় তিনি ডেকার্টের ভাষ্যনামাকে ফারসি ভাষায় অনুবাদ করেন।

Gobino তাঁর ঐ গ্রন্থে সাদরুল মুতাআল্লেহীনের জীবনচরিত বর্ণনা প্রসঙ্গে দর্শনের মহামতি মীর মুহাম্মাদ বাকের দামাদকে একজন Dialectician (দ্বান্দ্বিক মতবাদী) বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানে তিনি মীর দামাদের ক্লাসে মোল্লা সাদরার অংশগ্রহণ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

শেখ বাহায়ীর ইশারায় হয়েছিল বলে উল্লেখ করার পর মীর দামাদের নিকট মোল্লা সাদরার শিক্ষাগ্রহণের ফলাফলকে এভাবে তুলে ধরেছেন : 'এবং কয়েক বছর পরে তাঁর ভাষার যে বিশুদ্ধতা ও আলঙ্কারিক দক্ষতার কথা আমরা জানি, তা অর্জন করেন।'

এখানে প্রাচ্যবিদদের নীতির সমালোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। কারণ, এটা অমূলক যে, বিজাতীয় লোকদের নিকট থেকে আমরা আশা করব যাতে তাঁরা এসে আমাদের দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাস কিম্বা সাহিত্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা দেবেন ও বিশ্বের সামনে এ সবের পরিচয় তুলে ধরবেন! আরবি ভাষায় একটি প্রবাদ রয়েছে যে, 'তোমার আঙ্গুলের নখের মত আর কিছুই তোমার পিঠ চুলকে দেয় না।' যদি কোন জনগোষ্ঠী বিশ্ববাসীর সামনে নিজেকে ও নিজের ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্ম, কিম্বা দর্শনকে পরিচিত করাতে চায়, তাহলে তার একমাত্র উপায় হল এ কাজ তাদের নিজেদের দ্বারাই সম্পন্ন হওয়া। বিজাতীয়রা যদি সম্পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথেও তা করতে যায় তবুও শেষ পর্যন্ত তাদের নিজেদেরই সম্পূর্ণ পরিচিতি না থাকার কারণে বৃহত্তর ভ্রান্তির কবলে পড়তে পারেন। যেখানে ইতিহাস ও কৃষ্টি-কালচারের মত সামান্য ব্যাপারেই এরূপ অনেক ঘটনা ঘটেছে, সেখানে দর্শনের ক্ষেত্রে তো বলার অপেক্ষাই রাখে না, যা অনুধাবন করা বিশেষজ্ঞদের কাজ। শুধু ভাষা জানা কিম্বা কতেক বই-কিতাব সংগ্রহ করাই যথেষ্ট নয়। খোদ ইরান যেখানে ইবনে সিনা ও সাদরুল মুতাআল্লেহীনের মত মহান দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের প্রতিপালন ভূমি ছিল, সেখানেই প্রতি যুগে যেসব জ্ঞানপ্রেমী তাঁদের সেসব উচ্চতর চিন্তা-দর্শনের সাথে পূর্ণাঙ্গভাবে পরিচিত হতে চাইতেন তাঁরা জীবনের অনেকগুলো বছর এ কাজে ব্যয় করতেন। অবশেষে এরূপ হাজারও জ্ঞানতাপসের মধ্য থেকে হাতেগোনা কয়েকজন মাত্র এ কাজে সফল হতে পারতেন। কাজেই আমরা কীভাবে নিশ্চিত হতে পারি যে, দশ শতাব্দীকাল পূর্বে ইসলামী দর্শন, উদাহরণস্বরূপ ইবনে সিনার চিন্তাসমূহ যেভাবে তাঁর শিষ্যদের বোধগম্য হত, তাঁদের অনুবাদকর্মেও ঠিক সেরূপ প্রতিফলিত হয়েছে।

যে সময়ে সাদরুল মুতাআল্লেহীন ইরানে দর্শনকে ঢেলে সাজানো এবং নতুন এক দার্শনিক কাঠামো গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত ছিলেন (খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতক), ঠিক সে সময়ে ইউরোপেও বিজ্ঞান ও দর্শনে এক মহা আলোড়ন সূচিত হয়, যার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল আরও কয়েশ' বছর আগে থেকে। সাদরুল মুতাআল্লেহীন নির্জন গৃহকোণে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বসে চিন্তা ও গণিত চর্চায় নিমগ্ন হন এবং কিছুকালের জন্য কোম নগরীর পর্বতদেশকে এ কাজের জন্য বেছে নেন যাতে স্বীয় সুবিস্তৃত চিন্তার ফসলকে উত্তমরূপে কাগজে লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হন। আর ইউরোপে ডেকার্ট সে সময় নতুন এক মুক্তির ডাক দেন এবং প্রাচীনদের অনুসরণের শিকল খুলে ফেলেন। রচিত হয় নতুন এক পথ চলা। তিনিও হল্যান্ডের এক প্রান্তে কয়েক বছরের জন্য নির্জনবাস বেছে নেন এবং দৈনন্দিন জীবনের ঝামেলামুক্ত হয়ে স্বীয় অবসরকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পেছনে উৎসর্গ করেন। ডেকার্টের পর থেকে ইউরোপ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের পথে অবিশ্বাস্য গতিতে অগ্রসর হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখায় গবেষণার পদ্ধতি বদলে যায় এবং নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্রে যেমন অগণিত বিজ্ঞানী ও পণ্ডিতের আবির্ভাব ঘটে, তদ্রূপ একাদিক্রমে বড় বড় দার্শনিকও আবির্ভূত হন এবং দর্শন একটি নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে।

মধ্যযুগীয় দর্শনে যেসব বিষয়ে বেশি মনোযোগ দেওয়া হত, ইউরোপের আধুনিক দর্শনে সেগুলোর প্রতি কমই দৃষ্টি দেওয়া হয়। তৎপরিবর্তে এক শ্রেণীর নতুন বিষয় যেগুলোর প্রতি প্রাচীন দার্শনিকরা কম মনোযোগ দিতেন সেগুলো বেশি বেশি উল্লিখিত হয়।

ইউরোপে ডেকার্টের সময় থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের উদ্ভব হয়েছে। প্রত্যেক দলই একটি বিশেষ মতবাদের অনুসারী হয়েছেন, কেউ বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শনে মত্ত হয়েছেন, কেউ আবার ব্যবহারিক বিজ্ঞানের (অভিজ্ঞতাবাদী) চোখ দিয়ে দর্শনকে দেখেছেন। আবার কেউ কেউ উচ্চতর দর্শন তথা ঈশ্বরতত্ত্বকে আলোচনা ও গবেষণার যোগ্য বলে মনে করেছেন এবং এ সম্পর্কে স্ব স্ব মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ করেছেন। আর কেউ কেউ দাবি করেছেন যে, মূলগতভাবে মানুষ এসব বিষয় উপলব্ধি করতে অপারগ এবং এ পর্যন্ত এ ব্যাপারে পক্ষে-বিপক্ষে যা কিছুই বলা হয়েছে তার সবই বিনা প্রমাণে বলা হয়েছে। তবু বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একদল ঈশ্বরবাদী হয়েছেন, আরেকদল হয়েছেন বস্তুবাদী। মোটকথা, যে শাস্ত্র প্রাচীনকাল থেকে real philosophy তথা উচ্চতর বিদ্যা বলে পরিচিত হয়ে এসেছে (অর্থাৎ জগতের সামগ্রিক ব্যবস্থা এবং বিশ্বের আপাদমস্তক ব্যাখ্যা করার জন্য গবেষণা করা হয় যে বিদ্যায়) তা ইউরোপে মধ্যযুগে যেমন, আধুনিক যুগেও তেমনি উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি লাভ করেনি এবং দর্শনকে বিক্ষিপ্ততা ও বিভক্তি থেকে রক্ষা করতে পারে–

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

এমন কোন শক্তিশালী ও সন্তোষজনক সিস্টেম দাঁড় করাতে সক্ষম হয়নি। এর ফলে ইউরোপে দর্শনের মধ্যে সাংঘর্ষিক মতবাদ সৃষ্টির কারণ হয়েছে। আর ইউরোপের গবেষণার যেটুকু উল্লেখযোগ্য ও প্রশংসনীয় এবং যা দার্শনিক বিষয়াবলি নামে প্রসিদ্ধ, তা আসলে দর্শনের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং গণিত, পদার্থবিজ্ঞান কিম্বা মনোবিজ্ঞানের সাথে সংশ্লিষ্ট।

আর ন্যায়ত বলতে হয় যে, মুসলিম দার্শনিকরা এ বিদ্যার গবেষণায় যেভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন, তাতে তাঁরা সফলভাবেই অগ্রসর হয়েছেন এবং আধা সমাপ্ত গ্রীক দর্শনকে যথেষ্ট এগিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন। যদিও মুসলমানদের মধ্যে প্রবেশের সময় গ্রীক দর্শনে সর্বসাকুল্যে দু'শটির বেশি বিষয় ছিল না। কিন্তু মুসলিম দর্শনে এ সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে সাতশ'রও বেশি। তাছাড়া যুক্তি-প্রমাণের (principles) তথা মৌলনীতি ও প্রেক্ষিত-পদ্ধতিসমূহ, এমনকি গ্রীসের প্রাথমিক বিষয়াবলির ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণরূপে বদলে গেছে এবং দার্শনিক বিষয়াবলি প্রায় গাণিতিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে। এ বৈশিষ্ট্য মোল্লা সাদরার দর্শনে পুরোপুরিভাবে প্রকাশমান। এদিক থেকে তিনি মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রবর্তী।

এ মন্তব্যগুলো যে নিছক দাবি নয়; বরং এটাই বাস্তব, তা স্পষ্ট করার জন্য আমাদের আরও গবেষণা চালিয়ে যেতে হবে।

যে সময়কালে ইউরোপীয় দর্শনের ঢেউ ইরানে এসে পৌছায় সে সময় স্বল্প-বিস্তর দার্শনিক রচনা ইউরোপীয় ভাষাসমূহ থেকে ফারসিতে অনূদিত হয়। সম্ভবত ফারসি ভাষায় আধুনিক দর্শনের সর্বপ্রথম প্রকাশনা হল Verses of Descartes এর অনুবাদ, যা এক শতাধিক কাল পূর্বে কতিপয় সহযোগীর সহযোগিতা নিয়ে Cont Gobino এর মাধ্যমে অনূদিত হয়। অবশ্য পরবর্তীকালে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান যতই তোপধ্বনি তোলে, ততই পশ্চিমা দার্শনিক ও পণ্ডিতদের নাম মুখে মুখে ফিরতে থাকে এবং ক্রমে ক্রমে আরও বেশি গ্রন্থ ফারসি ভাষায় প্রকাশিত হয়।[১] আর যদিও কিছুকাল ধরে বিদগ্ধ অনেকের মনোযোগ এ দিকটির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে যে, আধুনিক দর্শনের মতবাদ ও বিশ্বাসসমূহ প্রাচীন দর্শনে অনুপ্রবেশ করুক এবং আধুনিক মতবাদসমূহের ও মুসলিম দার্শনিকবৃন্দের মতামতসমূহের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা হোক, কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, অদ্যাবধি এ আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ লাভ

১. বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

করেনি। আর সে সময় থেকে আজ পর্যন্ত যত দার্শনিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো হয় নেহায়েত প্রাচীনদের পন্থায় রচিত (কখনও কখনও প্রকৃতি ও মহাকাশ সম্পর্কিত বিষয়াদির ওপরেও ছিল, আধুনিক মতবাদসমূহ যার ঘোর বিরোধী। উপরন্তু সেগুলোতে যেসব নীতি-পন্থা অনুসরণ করা হয়েছিল, তাও ছিল প্রাচীন ধারার), নচেৎ শুধু মতবাদসমূহের অনুবাদ ও বিবরণসর্বস্ব। অপরদিকে আধুনিক দার্শনিকদের গবেষণায় প্রবেশ ও বের হওয়ার পদ্ধতি প্রাচীন দার্শনিকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া ছাড়াও যেসব বিষয় প্রাচীন দর্শনে বিশেষ করে সাদরুল মুতাআল্লেহীনের দর্শনে প্রধান ভূমিকা রাখত, সেগুলো আধুনিক দর্শনে তাচ্ছিল্যের শিকার হওয়া কিম্বা আদৌ সেগুলোর দিকে ভ্রূক্ষেপ না করার ফলে এ দু'ধারার বই-পুস্তক পাঠ করে জ্ঞানপিপাসুদের যে লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। তাই আমরা যখন মুসলিম দর্শনের হাজার বছরের গবেষণা অধ্যয়ন করব তখন পাশ্চাত্যের আধুনিক দর্শনের দিকপালদের গবেষণা-কর্মের প্রতিও পুরোপুরি লক্ষ্য রাখব। কিন্তু আমাদের উচিত হবে দর্শনের সীমানাকে সুরক্ষিত রাখা, যেন বিভিন্ন বিজ্ঞানের সাথে এর সংমিশ্রণ না ঘটে। দর্শনের সাথে বিজ্ঞানের সম্পর্ক আছে বটে। কিন্তু প্রকৃত দর্শনে প্রকৃতিবিজ্ঞান ও মহাকাশীয় বিজ্ঞানের সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক। প্রয়োজন হলে আধুনিক বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক অর্জন থেকে উপকৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

প্রসঙ্গত, সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মরহুম আল্লামা তাবাতাবায়ী (রহ.)-এর অনবদ্য অবদান এবং তাঁর রচিত পাঁচ খণ্ডের দর্শন গ্রন্থ 'Principles of Philosophy and Method of Realism' সম্পর্কে আলোকপাত করা প্রয়োজন। আল্লামা তাবাতাবায়ী জীবনের সুদীর্ঘ সময় ধরে দর্শনের ওপর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন এবং ফারাবী, ইবনে সিনা, শেখ সোহরাওয়ার্দী, সাদরুল মুতাআল্লেহীন প্রমুখের ন্যায় বড় বড় মুসলিম দার্শনিকের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামতসমূহ বিচক্ষণতার সাথে আত্মস্থ করেন। পাশাপাশি ইউরোপের গবেষক দার্শনিকদের চিন্তাধারাকেও ভালভাবে রপ্ত করেন। ইরানের জ্ঞান-নগরী কোমে তিনি ফেকাহ, তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে অধ্যাপনা করা ছাড়াও দর্শন (হিকমত) শাস্ত্রের একক ও অনন্য শিক্ষাগুরুতে পরিণত হন। দর্শনের ওপর এরূপ পাণ্ডিত্য অর্জনের পর তিনি প্রত্যয় গ্রহণ করেন যে, বৃহত্তর কলেবরে একটি দর্শনের গ্রন্থ রচনা করবেন যা একদিকে মুসলিম দর্শনের হাজার বছরের মূল্যবান গবেষণাকে লিপিবদ্ধ করবে, অপরদিকে এতে আধুনিক দর্শনের সকল মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ থাকবে; আর প্রাথমিক দৃষ্টিতে প্রাচীন ও

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

আধুনিক দর্শনের মতবাদসমূহের মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য চোখে পড়ে এবং এ দু'টিকে আলাদা ও সম্পর্কহীন শাস্ত্র হিসাবে প্রতিপন্ন করা হয়, তা যেন বিদূরিত হয়ে যায়। পরিশেষে দর্শনের এমন এক রূপ প্রকাশ পায় যা এ যুগের চিন্তাগত চাহিদার সাথে উত্তমভাবে খাপ খায়। বিশেষ করে ঈশ্বরবাদী দর্শনের মূল্য (যার অগ্রপথিকরা ছিলেন মুসলিম পণ্ডিতবর্গ এবং বস্তুবাদী দর্শনের প্রোপাগাণ্ডার ডামাডোলের আড়ালে যে দর্শনের যুগ শেষ হয়ে গেছে বলে প্রচারণা রয়েছে) যেন স্বমহিমায় ফুটে ওঠে।

একদিকে ইউরোপীয় দার্শনিকদের দর্শন-চিন্তা ও মতবাদগুলো ব্যাপকভাবে অনূদিত হয়ে কিম্বা হুবহু মূল রচনাবলি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রকাশিত হওয়া এবং বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত যুবকদের সেদিকে ঝুঁকে পড়া (যা প্রকৃতপক্ষে তাদের কৌতুহলী মনোবৃত্তিরই পরিচয় বহন করে), অপরদিকে আধুনিক বস্তুবাদী দর্শনের (Dialectic Materialism) সুসংগঠিত ও বেপরোয়া রাজনৈতিক ও দলীয় প্রচারণা আল্লামাকে স্বীয় প্রত্যয়ে আরও দৃঢ় করে তোলে। প্রথম পদক্ষেপে তিনি সহকর্মী ও নির্বাচিত শিষ্যবৃন্দের সমন্বয়ে একটি 'Council of Philosophy' গড়ে তোলেন। আল্লামার নেতৃত্বে এ কাউন্সিল দর্শন চর্চায় যে অভাবনীয় অবদান রাখে তা দর্শনকে ইরানে নতুন এক যুগে প্রবেশ করায়। ইতিপূর্বে দর্শন চর্চাকারীদের জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ ছিল কেবল সাধারণ বই-কিতাবে লিপিবদ্ধ বিষয়াবলির মধ্যে। কিন্তু আল্লামা তাবাতাবায়ীর এ সৃজনশীল উদ্যোগের সুবাদে অচিরেই দর্শন চর্চাকারীদের জ্ঞানের পরিধি সীমানা অতিক্রম করে ব্যাপক বিস্তার লাভ করে। এখন তাঁরা বস্তুবাদী দর্শনের তত্ত্বগুলো সম্পর্কে অনেক বেশি পরিচিত এবং সেগুলোর দোষত্রুটি সম্পর্কে সম্যক অবগত।

'Principles of Philosophy and Method of Realism' গ্রন্থে আল্লামা তাবাতাবায়ী প্রাচীন ও আধুনিক যুগের ঈশ্বরবাদী ও জড়বাদী নির্বিশেষে বহু সংখ্যক দার্শনিকের মতামত ও মতবাদ পর্যালোচনা এবং বিশ্লেষণ করেছেন। তাছাড়া বিশেষ এক কারণে তিনি দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের প্রতি কিছু বেশি মনোযোগী হয়েছেন এবং এ মতবাদের সকল ত্রুটি-বিচ্যুতি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। প্রাচীনকাল থেকেই 'আদি কারণ' কিম্বা সৃষ্টির উদ্দেশ্য থাকা নাকচ করা অথবা আত্মার অমরত্ব ও অজড়ত্বকে নাকচ করা সংক্রান্ত বস্তুবাদী মতবাদ ও ধ্যান-ধারণাসমূহ দর্শনের বই-পুস্তকে উত্থাপিত হয়। কিন্তু যে বিষয়টি সর্বসম্মত, তা হল প্রাচীনদের মধ্যে কখনও অধিবিদ্যাকে সামগ্রিকভাবে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

অস্বীকার করবে এবং অস্তিত্বকে বলতেই জড়বস্তু অর্থাৎ অস্তিত্ব = জড়বস্তু বলে মনে করবে এহেন কোন বস্তুবাদী মতবাদের উৎপত্তি ঘটেনি। সে সুদূর অতীত, যখন দার্শনিক আলোচনার চর্চা হত, তখন থেকেই অধিবিদ্যা ও প্রাকৃতিক জগতের ঊর্ধ্বে এক পরাপ্রকৃতি জগতের আলোচনা ছিল। তবে এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এসব আলোচনা প্রথম দিকে খুবই সরল ও সাধারণ স্তরের ছিল। পরবর্তীকালে তা ক্রমান্বয়ে যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা পায় এবং অধিকতর বিস্তার লাভ করে। প্রাচীন দার্শনিকদের থেকে বর্ণিত ভাষ্য অনুযায়ী দেখা যায়, সর্বপ্রথম যে দার্শনিক আলোচনাগুলো একটি দার্শনিক মতবাদের রূপ লাভ করে তা Hermes কর্তৃক গোড়াপত্তন কৃত। Balinas এর The wise on the causes বই থেকে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে দর্শন 'বস্তুসমূহের কারণ' নামে অ্যাখায়িত হত। এ মতবাদের অনুসারীরা প্রাকৃতিক জগতের অতিবর্তী আরেকটি জগতের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন।

এ সময়ের পরে দর্শনে মাইলেসীয়দের যুগ শুরু হয়। এ যুগে বিভিন্ন রকমের দার্শনিক মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে। মূলত এ অধ্যায়কে দর্শনের 'দ্বিতীয় অধ্যায়' বলা যায়। প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের বর্ণনামতে এবং তাদের মতামত ও বিশ্বাস সম্বলিত দর্শনের বই-পুস্তক থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী দেখা যায় যে, এ যুগেও প্রকৃতি জগতের অতিবর্তী পরাপ্রাকৃতিক জগতের আলোচনা ছিল। তদ্রূপ, মাইলেসীয়দের সমসাময়িক কিম্বা তারও পরবর্তী যুগের গ্রীকগণ সক্রেটিসের সময় পর্যন্ত এ চর্চা অব্যাহত রাখেন। এ দিকে মাইলেসীয়দের (খ্রিস্টপূর্ব ৬ শতক) সমসাময়িক ভারতীয় ও চীনা দার্শনিকদের থেকে যেসব বর্ণনা পাওয়া যায়, সেটাও প্রায় এরূপই। মোটকথা, প্রাচীনদের মধ্যে এমন কোন নির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদ পাওয়া যাবে না যা পরাপ্রকৃতিকে সামগ্রিকভাবে নাকচ করে থাকবে। আর বেশিরভাগ যুগে বস্তুবাদী তথা প্রকৃতিবাদী হিসাবে যে কতিপয় ব্যক্তির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তারা আসলে সংশয়গ্রস্ত ও দিশেহারা লোকজন। তারা দাবি করত যে, ঈশ্বরবাদীদের যুক্তি-প্রমাণ তাদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি।

সুতরাং বস্তুবাদী দর্শনের জন্য কোন ইতিহাস দাঁড় করানো যায় না। কেবল অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে ইউরোপে কতিপয় কারণে একটি শোরগোল পরিদৃষ্ট হয় যা নিজেকে একটি দার্শনিক রূপ দেয় এবং অপরাপর দার্শনিক মতবাদের বিপরীতে অতিকায় দেহাবয়ব নিয়ে জাহির হয়, আর শক্তির প্রকাশ ঘটায়। কিন্তু অচিরেই বিংশ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

শতাব্দীতে তা পরাভূত হয় এবং স্বীয় জৌলুস ও দাপট হারিয়ে ফেলে। কাজেই, বস্তুবাদী দর্শনের প্রকৃত ইতিহাস শুরু হয় অষ্টাদশ শতক থেকে।

কিন্তু বস্তুবাদীরা প্রাণান্তকর চেষ্টা চালায় তাদের মতবাদকে একটি ঐতিহ্যপূর্ণ ও ইতিহাসসমৃদ্ধ মতবাদ বলে প্রতিষ্ঠা করতে এবং বিশ্বের বড় বড় দার্শনিকদের তাদের মতই বস্তুবাদী ঘরানার বলে প্রতিপন্ন করতে। সর্বোপরি বস্তুগত জ্ঞান-বিজ্ঞানের ঝাণ্ডাবাহী হিসাবে বস্তুবাদী দার্শনিকদেরই অগ্রসারিতে প্রতিষ্ঠিত করতে। এমনকি অ্যারিস্টটল সম্পর্কেও তারা বলতে দ্বিধা করেনি যে, তিনি বস্তুবাদ ও ভাববাদের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। আর কোন কোন লেখনিতে তারা ইবনে সিনাকেও বস্তুবাদী বলে আখ্যায়িত করে থাকে। বস্তুবাদীরা তাদের রচনাবলিতে মাইলেসীয় থেলিস (Thales) থেকে সক্রেটিস পর্যন্ত সকল দার্শনিককে বস্তুবাদী আখ্যা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত জার্মান বস্তুবাদী Buckner ডারউইনের মতবাদের ওপরে যে ব্যাখ্যা লিখেছেন, তার পঞ্চম প্রবন্ধে অ্যানাক্সিম্যান্ডার (Anaximander), অ্যানাক্সিমিনিস (Anaximienes), জেনোফ্যানিস (Xanophanes), হিরাক্লিটাস (Heraclitus), অ্যাম্পিডক্লিস (Empedocles) ও ডেমোক্রিটাস (Democritus) প্রমুখ দার্শনিককে বস্তুবাদী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হল এ সকল অবিস্মরণীয় দার্শনিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে কাউকে পরাপ্রকৃতি অস্বীকারকারী অর্থে যে বস্তুবাদ, সেরূপ বস্তুবাদী বলা যায় না। যদিও এ সকল ব্যক্তিকে দর্শনের ইতিহাসের পরিভাষায় প্রকৃতিবাদী তথা বস্তুবাদী বলে আখ্যায়িত করা হয় (পিথাগোরীয় গণিতবাদীদর বিপরীতে, যাঁরা জগতের মৌলিক দ্রব্য 'সংখ্যা' থেকে বলে উদ্ভূত বলে বিশ্বাস করতেন এবং সোফিস্টদের বিপরীতে, যাঁরা external world তথা বহির্জগৎ এর অস্তিত্ব অস্বীকার করতেন) এ হিসাবে যে, তাঁরা প্রকৃতির মৌলিক দ্রব্য একটি 'পদার্থ' বলে মনে করতেন। যেমন থেলিস মনে করতেন, জগতের সমুদয় বস্তু পানি থেকে সৃষ্ট। আবার অ্যানাক্সিম্যান্ডারের মতে, পৃথিবীর সমুদয় বস্তু একটি মাত্র মৌলিক দ্রব্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ মৌলিক দ্রব্য থেলিসের 'পানি' নয়। এ মৌলিক দ্রব্য আমাদের জ্ঞাত অন্য কোন দ্রব্যও নয়। তাঁর মতে, এ মৌলিক দ্রব্য শাশ্বত ও সীমাহীন নয় এবং এ মৌলিক দ্রব্য পৃথিবীর যাবতীয় দ্রব্যের মূলে বিদ্যমান। আর অ্যানাক্সিমিনিসের মতে, মৌলিক দ্রব্য হচ্ছে বায়ু। হিরাক্লিটাসের মতে, আগুন; আর ডেমোক্রিটাসের মতে পরমাণু। এ দার্শনিকবৃন্দ সকলেই প্রকৃতির ঘটনাপ্রবাহকে প্রাকৃতিক কারণাবলি দ্বারা ব্যাখ্যা করতেন ঠিকই, কিন্তু এমন কোন প্রমাণ নেই যে,

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

তাঁরা পরাপ্রকৃতিকে অস্বীকার করতেন। প্লেটে ও অ্যারিস্টটল স্ব স্ব লেখনীতে এ সকল ব্যক্তির নাম অনেকবার উল্লেখ করেছেন, কিন্তু কোথাও তাঁদেরকে পরাপ্রকৃতি অস্বীকারকারী বলে আখ্যায়িত করেননি।

বস্তুবাদীরা ও অন্যান্য কতিপয় লেখক যে বিষয়কে তাদের প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করে (যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে), তার সাথে পরাপ্রকৃতিকে নাকচ করার কোন সম্পর্ক নেই। আর যদি কথা এমনই হয় যে, যাঁরাই মৌলিক দ্রব্যের কথা বলবেন এবং প্রকৃতির ঘটনাবলিকে প্রাকৃতিক কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করবেন, তাঁদেরকেই বস্তুবাদী বলা হবে, তাহলে সকল ঈশ্বরবাদীকেও বস্তুবাদী বলতে হয় যাঁদের মধ্যে সক্রেটিস, প্লেটে, অ্যারিস্টটল, ফারাবী, ইবনে সিনা, সাদরুল মুতাআল্লেহীন ও ডেকার্টও রয়েছেন। শুধু তা-ই না, নবী-রাসূল ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরাও বাদ থাকেন না। অথচ দার্শনিকদের বই-পুস্তকে প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের পরাপ্রকৃতি সম্পর্কিত মতামত উল্লিখিত হয়েছে, যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরবাদী ছিলেন। যেমন ঈশ্বরের 'জ্ঞান' বিষয়ক থেলিস ও অ্যানাক্সিমিনিসের বিশ্বাস।

আশ্চর্যের বিষয় হল স্বয়ং Buckner এমন কিছু বর্ণনা করেন যা তাঁর নিজ দাবির পরিপন্থী। যেমন হিরাক্লিটাস সম্পর্কে তিনি বলেন : 'হিরাক্লিটাসের বিশ্বাস অনুযায়ী মানব আত্মা হল আগুনের শিখা, যা ঐশ্বরিক নিত্যতা থেকে উৎসারিত হয়েছে।'

আর অ্যাম্পিডক্লিস যাঁকে ডারউইনী মতবাদের জনক বলেন এবং স্বীকার করেন যে, তিনিই সর্বপ্রথম evolution and natural selection তত্ত্বকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা দেন, তাঁর সম্পর্কে বলেন : 'তিনি আত্মার বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাস করতেন এবং একে একটি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যজনিত বলে মনে করতেন, যে লক্ষ্যে আত্মা আরাম, আসক্তি ও প্রেমের প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে।'

তবে এখানে যে কথাটি বলা যেতে পারে সেটা হল এই যে, সক্রেটিসের আগের দার্শনিকরা অধিকাংশই পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঈশ্বর সম্পর্কে এক ধরনের অংশীবাদী বিশ্বাস পোষণ করতেন। Buckner হিরাক্লিটাস সম্পর্কে এক বর্ণনায় বলেন: 'জগতের মূল হল আগুন, যা কখনও শিখাময় হয়, আবার কখনও নিভু নিভু হয়ে আসে। আর এটা হল একটি খেলা মাত্র, যা Jupiter সর্বদা নিজে নিজে খেলে থাকেন।' অবশ্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এ সকল দার্শনিকের কথা রহস্য ও

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সংকেতমুক্ত নয়। তাই এটাই তাঁর আসল উদ্দেশ্য বলে ধরা যায় না। সাদরুল মুতাআল্লেহীন তাঁর আসফার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে থেলিস, অ্যানাক্সিমিনিস, অ্যানাক্সগোরাস, অ্যাম্পিডক্লিস, প্লেটো, ডেমোক্রিটাস, অ্যাপিকিওর প্রমুখের নিকট থেকে বর্ণনা উল্লেখ করেছেন এবং দাবি করেছেন যে, পূর্ববর্তী দার্শনিকদের এসব কথা রহস্যপূর্ণ ও সংকেতময় ছিল, কিন্তু বর্ণনাকারীরা তাঁদের সে আসল উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে পারেননি। অতঃপর সাদরুল মুতাআল্লেহীন তাঁদের সেসব বক্তব্যকে স্বীয় দাবি অনুযায়ী 'substancial motion' ও 'জগতের সৃষ্টি' অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রাচীন ও তৎপরবর্তী যুগের কোন কোন দার্শনিককে বস্তুবাদী প্রতিপন্ন করার সপক্ষে যেসব যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করা হয় সেগুলো এমন সব বিষয়, যা এ বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নয়। যেমন মৌলিক দ্রব্য ও মূল উপাদানে বিশ্বাস করা, প্রকৃতির ঘটনাবলিকে প্রাকৃতিক কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা, জাগতিক নিয়মকে একটি অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী নিয়ম মনে করা, অনস্তিত্ব থেকে কোন কিছু অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না বলে মনে করা, কিম্বা প্রকৃতির বিষয়াবলি অনুসন্ধানে প্রায়োগিক যুক্তিবিদ্যার প্রতি গুরত্বারোপ ইত্যাদি।

ঐশ্বরিক বিষয়াদিতে গভীরতা না থাকার কারণে বস্তুবাদীরা মনে করে থাকে যে, উপরিউক্ত বিষয়গুলো প্রকৃতি জগতের অতিবর্তী এক পরাপ্রকৃতির প্রতি বিশ্বাসের পরিপন্থী। আর এ কারণে যে কেউ এ বিষয়গুলোর কোন একটির প্রবক্তা ও বিশ্বাসী হয়েছেন, তাঁকেই বস্তুবাদী বলে চিহ্নিত করেছে। যদিও উক্ত ব্যক্তি স্বয়ং এর বিপরীতে তাঁর অবস্থান স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন, তদুপরি বস্তুবাদীরা তাঁকে ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। অবশ্য বস্তুবাদী নন এমন কিছু সংখ্যক দর্শনের ইতিহাস লেখক এবং encyclopedia-র লেখকও একই ভুল করেছেন।

কেবল যে জিনিসটি সর্বসম্মত তা হল, প্রাচীনদের মধ্যে কেউ কেউ আত্মার অশরীরত্ব ও মৃত্যুর পরে আত্মার অমরত্বকে অস্বীকার করেছেন। ডেমোক্রিটাস, অ্যাপিকিওর এবং তাঁদের অনুসারীরা এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী বলে মনে করা হয়। খ্রিস্টিয় ষোড়শ শতক থেকে ইউরোপেও 'মৃত্যুর পরে আত্মার অমর না থাকা' মতবাদের কিছু সংখ্যক অনুসারী পাওয়া যায়। বলা হয় যে, প্রথমবার ১৫১৬ খ্রিস্টাব্দে অ্যারিস্টটলের মতবাদকে খণ্ডন করে Petros Bombonatius 'আত্মার অশরীরত্ব' বিষয়ে একটি বই লেখেন। ক্রমান্বয়ে এ মত প্রচারিত হয় এবং কিছু সংখ্যক অনুসারী গড়ে ওঠে। এ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিষয়ে কিছু লেখালেখিও প্রকাশিত হয়। আর Buckner তাঁর গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রবন্ধে যা লিখেছেন, সে অনুযায়ী Bombonatius নিজেই খ্রিস্টিয় শিক্ষার কট্টর অনুসারী ছিলেন এবং তা সমর্থন করতেন। তিনি বলেন, সতের শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত সকলেই এরূপ ছিলেন। আর তাঁদের অন্তরের গভীরে নিহিত বিশ্বাসই হয়ত এর কারণ ছিল।

Buckner এর বর্ণনা অনুযায়ী কেবল আঠারো শতকেই কতিপয় দার্শনিক আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন। Baron d'Holbach ১৭৭০ সালে The system of Nature গ্রন্থটি লেখেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও ধর্মকে অস্বীকার করেন। আঠারো দশকে একদল লেখক একটি encyclopedia রচনায় লিপ্ত হন। এদের মধ্যে বড় বড় কয়েকজন, যেমন Holbach, Didero এবং Dalamber প্রমুখ বস্তুবাদী ছিলেন। তবে Dalamber এর অবস্থানটা ছিল অধিকতর দ্বিধাগ্রস্ত ও দিশেহারার মত। Buckner বলেন : 'Dalamber একাধিকবার স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, পরাপ্রকৃতি সম্পর্কিত বিষয়াবলিতে 'জানি না' উত্তরটাই উৎকৃষ্ট উপায়।' Didero থেকেও বর্ণিত আছে যে, শেষাবধি তিনিও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যেই ছিলেন।

উনিশ শতকে বস্তুবাদী দর্শন আরও বেশি সমর্থক খুঁজে পায়। আর এর শেষার্ধে (১৮৫৯ খ্রি.) ডারউইনী বিবর্তনবাদ প্রচারিত হয়। বস্তুবাদীরা এ বিবর্তনবাদকে তাদের বস্তুবাদী দর্শনের প্রসারের জন্য মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে লুফে নেয়। ডারউইন বস্তুবাদী ছিলেন না। তিনি কেবল Biological দৃষ্টিকোণ থেকেই তাঁর মত উপস্থাপন করেন। কিন্তু তাঁর সময়ের বস্তুবাদীরা এ মতবাদকে তাদের বস্তুবাদী দর্শনের স্বার্থে ব্যবহার করে। ড. শিবলী শুমাইল একজন বিখ্যাত Materialist, তিনিই প্রথম ডারউইনের মতবাদকে আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। অতঃপর এর সাথে আরও কিছু অধ্যায় যোগ করে 'ফালসাফাতুল নুশু ওয়াল ইরতিকা' (উৎপত্তি ও বিবর্তনের দর্শন) শিরোনামে মূদ্রণ ও প্রকাশ করেন। বইয়ের ভূমিকায় তিনি স্বীকার করেন যে, ডারউইন কেবল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে (দার্শনিক নয়) বিবর্তন মতবাদকে (যা শুধু প্রাণীকুলের জন্য স্বতন্ত্র) ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর একদল বস্তুবাদী দার্শনিক, যেমন Haksil, Buckner প্রমুখ একে জড়বাদী ও বস্তুবাদী দর্শনের সনদ হিসাবে গ্রহণ করেন। এ বইয়ের ১৬ পৃষ্ঠায় তিনি বলেন : 'এর চেয়েও আশ্চর্যজনক হল যে, ডারউইন এ মতবাদের মূল প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন, কিন্তু এর থেকে যত ফলাফল গ্রহণ করা উচিত ছিল তিনি তা করেননি।'

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Buckner এর ব্যাখ্যার প্রথম নিবন্ধে (আরবি অনুবাদ) স্বয়ং ডারউইনের এ উক্তিটি উল্লেখ করা হয়েছে : 'এ পর্যন্ত যা কিছু আমার কাছে উদ্ঘাটিত হয়েছে সে অনুযায়ী পৃথিবী পৃষ্ঠে যত প্রাণীই সৃষ্টি হয়েছে তা সবই একটি মূল থেকে উৎসারিত। আর পৃথিবী পৃষ্ঠে সর্বপ্রথম যে জীবিত প্রাণী সৃষ্টি হয়, স্রষ্টা তার মধ্যে প্রাণ (আত্মা) ফুঁকে দেন।'

ঊনবিংশ শতকের শেষার্ধে ডারউইনবাদের ধারা দর্শনের বাজার সরগরম করে তুলেছিল। এছাড়াও আরেকটি বিশেষ ধারা উৎপত্তি লাভ করে বস্তুবাদকে নতুন এক রূপ দান করে। ফলে নতুন এক মতবাদের জন্ম হয় যা Dialectic Materialism বা 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ' নামে পরিচিত। এ মতবাদের দু'জন বিখ্যাত প্রবক্তা কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রেডরিক অ্যাঙ্গেল্‌স (১৮২০-১৮৯৫), যাঁরা অন্যসব কিছুর চাইতে বেশি বিপ্লবী চিন্তা-চেতনা ও উগ্র সামাজিক ভাবাবেগের অধিকারী ছিলেন। এ মতবাদের একটি পরিচয় হল এই যে, এটি বিশেষ Dialectical logoc অনুসরণ করে থাকে। এ মতবাদের আসল প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস অল্প কিছুদিনের জন্য বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক হেগেল-এর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর কাছ থেকেই দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিদ্যা শিক্ষা নেন। হেগেল দার্শনিক চিন্তায় বস্তুবাদী ছিলেন না। কিন্তু কার্ল মার্কস বস্তুবাদী দর্শনকেই পছন্দ করলেন এবং সেটা তাঁর শিক্ষকের কাছ থেকে শেখা Dialectical logoc এর ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। আর এ থেকেই Dialectic Materialism বা দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ জন্ম নেয়।

এ মতবাদের আরেকটি পরিচয় হল এ পর্যন্ত বিশ্বে আবির্ভূত হওয়া অপরাপর দার্শনিক স্টিস্টেমগুলোর বিপরীতে এর জন্ম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দার্শনিক বিষয়াবলির গবেষণা নয়; বরং মূল লক্ষ্য হল সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিশেষ মতাদর্শ ও চিন্তাধারাসমূহের ভিত্তিমূল ও প্রেক্ষিতসমূহ খুঁজে বের করা। এ মতবাদের ঝাণ্ডাধারীরা অন্যান্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদের ন্যায় স্বীয় আয়ুষ্কালকে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক গুঢ় রহস্যাবলি ভেদ করার লক্ষ্যে গবেষণা ও অনুসন্ধানে নিয়োগ করার পরিবর্তে রাজনৈতিক দল গঠন ও রাজনৈতিক সংগ্রাম করে কাটিয়েছেন।

১৯৪৬ সালে ইরানে প্রকাশিত এ মতবাদের পত্রিকা Internationalist এ লেখা হয় যে, কার্ল মার্কস ২৪ বছর বয়সে যখন তাঁর পিএইচডি'র থিসিস সমাপ্ত করেন, তখন রাজনৈতিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হন এবং ৩১ বছর বয়সে প্যারিস থেকে নির্বাসিত হয়ে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

ল-নে পাড়ি জমান। তিনি অনবরত সংগ্রাম, টানাপড়েন ও বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হন এবং নির্বাসিত জীবন কাটান। কখনও জার্মানীতে, কখনও ব্রুকসেল-এ অবস্থান করেন। আর এসব টানাপড়েনের মধ্যে কম্যুনিস্ট সংঘের পক্ষ থেকে ব্রুকসেল-এ কম্যুনিস্ট পার্টির মেনুফেস্টো প্রণয়ন করার দায়িত্ব লাভ করেন। এ সূত্রে তিনি Menifesto পুস্তকটি রচনা করেন। লেনিনের ভাষায় যা ছিল Historical materialism ও Dialectical materialism এর প্রকাশ এবং মার্কসীয় মতবাদের শ্রেণীগত সংগ্রাম তত্ত্ব, আর সামাজিক ও অর্থনৈতিক শিক্ষাসমূহের সনদ।

মার্কস ১৮৫১ সাল থেকে লণ্ডনে সামাজিক সংগ্রামে ব্যস্ত থাকার পাশাপাশি নিজের অবসরকে Capital পুস্তকটি রচনায় ব্যাপৃত করেন, যা ছিল political economy এর ওপরে একটি মার্কসীয় তত্ত্ব।

আর উক্ত পত্রিকার লেখনী অনুযায়ী অ্যাঙ্গেল্‌স ১৮ বছর বয়সে স্কুল ত্যাগ করেন এবং ২১ বছর বয়সে বার্লিনে পাড়ি জমান। সেখানে তিনি সেনাবাহিনীতে নাম লেখান এবং সরকারী কর্তব্য পালনের পাশাপাশি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফারেন্সসমূহে অংশগ্রহণ করেন। তিনি উকাত শহরে হেগেলীয় মতবাদের বামপন্থীদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং ২৪ বছর বয়সে প্রথমবারের মত মার্কসের সাথে তাঁর দেখা হয়। সেখান থেকেই তাঁদের জোটবদ্ধ সংগ্রাম শুরু হয়।

এ ঘটনার পর বস্তুবাদী দর্শনের প্রসার রাজনৈতিক দলের অভিলাষ পূরণের অনুবর্তী হয়ে পড়ে। আর কম্যুনিস্ট পার্টি যে পরিসরে বিশ্বে বিস্তার লাভ করে, Dialectic materialism নামের এ নতুন মতবাদকে সেই পরিসরে সাথে করে নিয়ে যায়। এ কারণে বিগত বছরগুলোতে যেসব দেশে কম্যুনিজমের পদচারণা রয়েছে, সেসব দেশে Dialectic materialism শিরোনামে অনেক প্রবন্ধ ও রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এসব প্রকাশনা রাজনৈতিক দলের সাথে সংযুক্ত হওয়ার কারণে একটি দলীয় মুখপত্র হিসাবে প্রচার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে, কোন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক প্রকাশনা হিসাবে নয়। দলীয় পত্রিকায় মূল লক্ষ্য থাকে রাজনৈতিক পথকে নিষ্কণ্টক করা এবং সকল প্রতিবন্ধক অপসারণ করা, আর তা করতে যে কোন উপকরণ বা মাধ্যম ব্যবহার করাকে বৈধ গণ্য করে থাকে (কেননা, দলীয় মূলনীতি অনুসারে 'লক্ষ্য মাধ্যমকে বৈধ করে দেয়')। দলীয় মূলনীতি কখনও সত্যকে 'ঠিক যেভাবে বিদ্যমান' সেভাবেই প্রতিফলিত করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ নয়; বরং এ ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, সত্যকে

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সেভাবেই প্রতিফলিত করতে হবে যাতে লক্ষ্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক রচনাবলিতে যেহেতু সাধারণত মূল উদ্দেশ্য থাকে সত্য অনুসন্ধানের সহজাত প্রবৃত্তি বা আকাঙ্ক্ষাকে পরিতুষ্ট করা, কাজেই উপরিউক্ত পন্থা পরিহার করা হয়।

নতুন শতাব্দীর বস্তুবাদীদের সামগ্রিকভাবে এ প্রতীতি জন্মেছে যে, ব্যবহারিক ও ফলিত বিজ্ঞান বস্তুবাদের অনুকূলেই এগিয়ে চলেছে। কিন্তু Dialectical materialism এর পক্ষাবলম্বীরা এমন বাড়াবাড়ির পথ বেছে নেয় যে, বস্তুবাদকে বিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ জাতক এবং অপরিহার্য ও অবশ্যম্ভাবী ফল বলে মনে করে। এমনকি যে সকল বৈজ্ঞানিক এসব বিজ্ঞানের জনক ছিলেন তাঁরা কেন বস্তুবাদী ছিলেন না– এ নিয়ে তারা বিস্ময় প্রকাশ করে।

এ মতবাদের পক্ষাবলম্বনকারীরা স্পষ্টতই দাবি করে যে, হয় ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার অনুসারী হতে হবে, ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মানতে হবে এবং সকল বিজ্ঞান, শিল্প ও আবিষ্কারকে অস্বীকার করতে হবে, নয়ত এগুলোকে গ্রহণ করতে হবে– ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার ওপর পদাঘাত করতে হবে!

ন্যূনতম যে উপকার একজন পাঠকের জন্য এ প্রবন্ধ পড়ে অর্জন হতে পারে তা হল, তিনি খুব ভালভাবে অনুধাবন করতে পারবেন যে, দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সমর্থকদের দাবির পরও বিজ্ঞানের সাথে বস্তুবাদের কোন সম্পর্ক নেই এবং এর সবগুলো মূলনীতিই (principles) হল এক ধরনের বিকৃতি ও ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত যা কিছু সংখ্যক লোক নিজস্ব রুচি থেকে গ্রহণ করেছে। এ সকল লোক তাদের প্রপাগাণ্ডায় যেসব প্রমাণ উপস্থাপন করে, সেগুলোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণটি হল এই যে, নতুন শতাব্দীতে ব্যবহারিক ও ইন্দ্রিয়নির্ভর বিজ্ঞানের উৎপত্তির সাথে সাথে ইউরোপের বস্তুবাদী দর্শনও জমে ওঠে। কিন্তু আসল ব্যাপার হচ্ছে, সাম্প্রতিক কালে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটেছে চিন্তা-চেতনার ওপরে যে কঠিন ধাক্কা দেওয়া হয়েছে এবং মহাজগৎ ও প্রকৃতি সম্পর্কিত মানুষের হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণাগুলোকে বাতিল করে দিয়ে চিন্তার মধ্যে যে বিস্ময়কর আতঙ্ক, উৎকণ্ঠা আর বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে তার প্রভাবে। যদিও এসব উত্থান-পতন সংঘটিত হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কিম্বা অনুমাননির্ভর বিষয়াবলির ক্ষেত্রে, কিন্তু অনিবার্যভাবে বুদ্ধিবৃত্তিক ও তাত্ত্বিক বিষয়াবলি এবং একইভাবে ধর্মীয় বিষয়াবলিকেও সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

সম্মুখীন করে। আর এরই ফলে ইউরোপে জন্ম নেয় ভিন্ন ভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী দার্শনিক মতবাদ। প্রতিটি মতবাদই এক একটি পথ অবলম্বন করে। যেমন একদল বস্তুবাদী হয়েছে, তদ্রূপ সোফিজমও দীর্ঘ দু'হাজার বছর ধরে নিস্প্রভ থাকার পর পুনরায় দ্বিগুণ বেগে প্রচলন লাভ করেছে। তাই আধুনিক বিজ্ঞানের অভ্যুদয়ের সময়কালে উৎপত্তি হওয়া মতবাদগুলোকেও যদি এ বিজ্ঞানের সাথে সাথে সঠিক ও যৌক্তিক সংযোগের প্রমাণ বলে ধরা হয়, তাহলে সোফিজম ও ভাববাদকেও আধুনিক বিজ্ঞানের সরাসরি ফল ও তারই অবিচ্ছেদ্য গুণ বলতে হবে।

তবে ইউরোপে বিভিন্ন মতবাদ জন্ম নেওয়ার পেছনে আরেকটি কারণ রয়েছে। সেটা হল একটি শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শন বিদ্যমান না থাকা, যা বিজ্ঞানের সাথে সঙ্গতিশীল হতে পারে। বিশেষ করে 'ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা' (হেকমতে এলাহী)-এর নামে তৎকালীন ইউরোপে বিদ্যমান একশ্রেণীর ফালতু আকীদা-বিশ্বাসই অন্য সবকিছুর চেয়ে বেশি বস্তুবাদীদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। আমরা যদি বই-পুস্তক খুলে দেখি তাহলে লক্ষ্য করব যে, এরা কোন্ শ্রেণীর বিশ্বাসকে কঠিন আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে থাকে। এমনকি ইউরোপের একদল আধুনিক বিজ্ঞানী যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন, তাঁরাও উক্ত ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার বিষয়বস্তু নিয়ে অনুযোগ করেছেন।

বিখ্যাত ঈশ্বরবাদী জ্যোতির্বিদ Flammarion তাঁর God in Nature বইতে লিখেছেন: 'সূক্ষ্মবিচারী ও সত্যদর্শী আজ মানবের চিন্তাশীল সমাজে দু'টি ভিন্ন ধরনের প্রবণতা অবলোকন করতে পারে যারা প্রত্যেকেই একদল লোককে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করেছে এবং তাদের ওপরে জেঁকে বসেছে। একদিক থেকে রসায়ন বিদ্যার বিজ্ঞানীরা তাঁদের পরীক্ষাগারে রাসায়নিক উপাদানসমূহের ক্রিয়া-বিক্রিয়া ও আধুনিক বিজ্ঞানের জড় অংশ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এবং পদার্থের যৌগ গঠনকারী উপাদানসমূহকে উদ্ঘাটন করে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে উদ্ঘাটিত এসব যৌগে কখনই ঈশ্বরের উপস্থিতি বা অস্তিত্ব প্রত্যক্ষণ ও ইন্দ্রিয়ানুভব করা যায় না। অপরদিকে, ঈশ্বরবাদী হাকিম তথা দার্শনিকরা ধুলোর আস্তরণে ঢাকা পড়া পুরাতন গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপির স্তূপের মধ্যে বসে কৌতুহল ও আগ্রহ সহকারে সেসব গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা, গবেষণা, অনুবাদ, কপি সংগ্রহ এবং এক শ্রেণীর ধর্মীয় আয়াত ও ভিন্ন ভিন্ন হাদীসের বিশ্লেষণ ও বর্ণনায় মত্ত থেকেছেন। আর স্বীয়

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

বিশ্বাস অনুযায়ী রাফাঈল ফেরেশতার কণ্ঠের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে ঘোষণা দিয়েছেন যে, চিরন্তন জনকের ডান চোখের মণি থেকে বাম চোখের মণির মাঝে ব্যবধান ছয় হাজার ফারসাখ।'

টমাস অ্যাকুনাস-এর Summa Contra Gentiles গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এর কিছু অংশে 'কয়েকজন ফেরেশতা কি সূঁচের অগ্রভাগে একত্রে অবস্থান করতে পারে?' শিরোনামে আলোচনা রয়েছে।[১]

ডক্টর শিবলী শুমাইল 'মাজমুআতু ফালাসাফাতুন নুশু ওয়াল ইরতিকা' নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 'আল-কুরআন ওয়াল ইমরান' শিরোনামে একটি প্রবন্ধের মধ্যে লিখেছেন : 'দর্শন মুসলমানদের মাঝে তার প্রথম আন্দোলনেই উচ্চতর মাত্রায় উৎকর্ষ লাভ করে। কিন্তু খ্রিস্টানদের মাঝে প্রথম সাক্ষাতেই ধ্বংস ও বিলীন হয়ে যায় এবং তার গোটা আলোচ্য বিষয় নিষিদ্ধ হয়ে যায়।'[২]

আধুনিক যুগে ডেকার্ট ও তাঁর অনুসারীদের মত কতিপয় বড় বড় ঈশ্বরবাদী দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছে, কিন্তু এ সকল দার্শনিকও একটি শক্তিশালী ও সন্তোষজনক ঈশ্বরবাদী দর্শন প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হননি।

নিঃসন্দেহে ঈশ্বরবাদী দর্শন যদি মুসলমানদের মাঝে যেভাবে উৎকর্ষ লাভ করেছে, ইউরোপেও সেভাবে উৎকর্ষ লাভ করত, তাহলে এতসব বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন দর্শনের উৎপত্তি ঘটত না। তদ্রূপ সংশয়বাদীদের (sceptic) জন্য অলীক কল্পনার জাল বোনা কিম্বা বস্তুবাদীদের এত অহঙ্কারী আত্মপ্রচারেরও সুযোগ মিলত না। সর্বোপরি, না ভাববাদের জন্ম হত, আর না বস্তুবাদের।

১. সেন্ট টমাস অ্যাকুনাস ছিলেন মধ্যযুগীয় ইউরোপের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক এবং স্কলাস্টিক দর্শনের পুরোধা। তাঁর গ্রন্থাবলি প্রায় চারশ' বছর যাবৎ ইউরোপের বিজ্ঞান ও ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্রসমূহে আনুষ্ঠানিক দর্শনের পাঠ্য ছিল।

২. কেবল Christian divinity এর অধ্যায় বাদে।

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com